১ম ভাগ।] বৈশাখ, ১৩০৪। [১ম সংখ্যা

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়।
৩৯।১নং মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২ নং মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট বিভাবতী প্রেসে
অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ একটাকা, মফস্বলে ১৷৵০ আঠার আনা।
প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄১৹ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। প্রতি মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে "পন্থা" প্রকাশিত হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ আমাদিগকে জানাইবেন, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

৪। টাকা-কড়ি ও পত্রাদি এবং প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৫। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৬। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

৭। "পন্থার" বিজ্ঞাপনের হার প্রকাশকের নিকট জ্ঞাতব্য।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়
৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১ম ভাগ।] বৈশাখ, ১৩০৪। [১ম সংখ্যা।

অবতরণিকা।

আমরা কেন আজ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে উপস্থিত হইতেছি তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া, নাম কেনা, বাণিজ্য করা কি আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; যে সুমহৎ ও দুরূহ ব্রতে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতার অভিমান নাই; তবে কেন জন সমাজে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রচার করিতে বসিয়াছি? কেন বসিয়াছি তাহা বলিবার জন্যই এই অবতরণিকা।

মানুষ, অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত। আগে কাল, পাছে কাল, মধ্যে কাল। মহাকালী, মহাশক্তি মানুষকে এক এক বার একটু একটু করিয়া কাল জলধিতে ডুবাইতেছেন; এক একবার একটু একটু করিয়া ভাসাইতেছেন; তাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে মানুষ কাল-সমুদ্রের বক্ষে সম্পূর্ণরূপে ভাসমান থাকে, তখন মানুষের আত্মা মানুষের নেতা, আধ্যাত্মিক ভাব ষোল আনা প্রস্ফুটিত। ত্রেতাযুগে মানুষ কাল-সমুদ্রে সিকি পরিমাণ

ডুবিয়া যায়; তখন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়—মানুষ তখন ঐহিক সুখসমৃদ্ধির রসাস্বাদন করিতে শিখে, কিন্তু ধর্ম্মভাব তখনও প্রবল থাকে। দ্বাপরে পাপবুদ্ধি ও পুণ্যবুদ্ধির আকর্ষণ সমান হইয়া দাঁড়ায়—একদিকে দৃশ্যমান সংসারের সুখ আর একদিকে অদৃশ্য পরকালের আনন্দ, এই দুইএর প্রবল দ্বন্দ্ব মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। তখন ত্রেতাযুগের ন্যায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তীক্ষ্ণ থাকে না, আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি তত শক্তিসম্পন্ন থাকে না, কিন্তু যাহা থাকে তাহারই প্রভাবে মানুষের উচ্চপ্রবৃত্তিগুলিকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি পরাভব করিতে পারে না। সুতরাং এই যুগের মানুষের মধ্যে অনেকেই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। এই যুগে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির—শ্রীকৃষ্ণ ও কংস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কলিতে পাপবুদ্ধির আকর্ষণ বারআনা, পুণ্যবুদ্ধি সিকি পরিমাণ কাজেই দুর্ব্বল। সহজ অবস্থায় উভয়ের সংগ্রামে পাপবুদ্ধিরই জয়। তাই এই কলিকালের যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই মানুষের ঐহিক ভোগতৃষ্ণা বাড়িতেছে, পারত্রিক সুখশান্তির উপর অনাস্থা হইতেছে। যাহা দুদিনের তাহা চিরকালের এবং যাহা চিরকালের তাহা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের মোহাবিষ্ট মনে প্রতিভাত হইতেছে। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, শক্তি, যাহা কিছু ক্ষমতা আছে তাহা ঐহিক সুখ, সমৃদ্ধি, যশ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি উপার্জ্জনের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। মহামায়ার মোহিনীশক্তি মানুষকে একেবারে অভিভূত করিয়াছে। মানুষ যদি কালস্রোতে গা ঢালিয়া দেয় তবে তাহার অদৃষ্টে সমুদ্রের অন্তস্তলের নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে; সবিতার বরেণ্য ভর্গ তাহার চিত্তাকাশে প্রকটিত হইয়া তাহাকে আর চিরসুখশান্তির নিকেতনে লইয়া যাইবে না।

কিন্তু মানুষ নিরবচ্ছিন্ন কালের দাস নহে। বিধাতা তাহাকে এক অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছেন—সেই শক্তি প্রভাবে সে কাল ও প্রাক্তন, উভয়কে স্ববশে আনিবার শক্তি অনুসারে, এই কলিকালকে আত্ম সম্বন্ধে দ্বাপর, ত্রেতা বা সত্যযুগে পরিণত করিতে পারে। এই শক্তির নাম পুরুষকার। এই শক্তি প্রভাবে মানুষ কর্ম্ম উপার্জ্জন ও কর্ম্ম সঞ্চয় করে। এ শক্তি না থাকিলে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। মানুষ যে সকল কর্ম্ম সঞ্চয় করে, এক

এক জন্মে তাহার কতক পরিমাণ ফল প্রমুখ হইয়া ফল বিধান করে। এই রূপে মানুষ কতক কর্ম্ম স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা এবং কতক কর্ম্ম প্রারব্ধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করে। স্বাধীন ইচ্ছাকে চেষ্টা দ্বারা বলবতী করাই মানুষের মনুষ্যত্ব; নতুবা তৃণ খণ্ডের ন্যায় জলস্রোতে ভাসিয়া যাওয়া পশু অপেক্ষাও অধোগতির পরিচয়।

মানুষ স্রোতের উজনে যাইতে পারে বলিয়াই ধর্ম্মের প্রয়োজন। যদি মানুষের সে শক্তি না থাকিত তবে ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা নিতান্ত অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক হইত। বর্ত্তমান কালে স্বভাবতঃ মনুষ্যের প্রবৃত্তি ঐহিক সুখ সম্ভোগে আকৃষ্ট। এই কাল-স্রোতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কার্য্যটা দুরূহ হইলেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়; চেষ্টা করিতে করিতে অবশ্যই কিছু না কিছু ফল দাঁড়ায়। আমরা এই চেষ্টার সহায়তা করিবার জন্য দীন বেশে উপস্থিত হইতেছি। মানুষের পুরুষকার শক্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ আকর্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও স্বাধীন ইচ্ছা প্রভাবে কার্য্য করিবার শক্তি সমুন্নত ও শিক্ষিত হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই শক্তির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য পূজা, অর্চ্চনা, সাধন, ভজন, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির ব্যবস্থা; সংকীর্ত্তন, শাস্ত্র পাঠ, কথকতা ইত্যাদির ব্যবস্থা পূর্ব্বকাল হইতেই আছে। বর্ত্তমান কালে মৌখিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখন—এই দুইটি নূতন পন্থা প্রচলিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কথা কর্ণকুহরে যত যায় ততই ভাল; এই ঘোর কলিকালে মানুষের সাংসারিক ভাব এত প্রবল যে ধর্ম্মভাব মনন করিবার প্রবৃত্তি অতি কম। সুতরাং ধর্ম্ম কথা, আধ্যাত্মিক কথা যত বলা যায় ততই ভাল, কেন না শুনিতে শুনিতে প্রবৃত্তি জন্মে, প্রবৃত্তি হইতে তদ্বিষয়ক চিন্তা এবং চিন্তা হইতে তদ্বিষয় চেষ্টা জন্মিয়া থাকে। সাধুকথা দশজনকে শুনাইবার অনেক প্রকৃষ্ট উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; আমরা দীনভাবে তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাসান্তে দুই চারি কথা বলিব। টহলিয়ার গলায় সুর নাই, তাল মান বোধ নাই, তবু অতি প্রত্যূষে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া জাগরিত ব্যক্তিকে দিবার প্রথম আরম্ভেই হরি নাম শুনাইয়া যায়। আমরাও মাসান্তে কিঞ্চিৎ সাধুকথা দ্বারা পাঠকের চিত্ত শান্তির চেষ্টা করিবার উদ্দেশে ক্ষুদ্র হইয়াও টহলিয়ার ন্যায় বহির্গত হইলাম। ইহাতে আমাদিগেরও যথেষ্ট

উপকার হইবে। গান শুনাইতে গেলে নিজেও শুনিতে হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে নিজেরাও মাসের মধ্যে দুই দশ দিন সদ্ভাবের সঙ্গতি করিতে পাইব। এই উভয়ই আমাদিগের পরম লাভ।

কোন বিষয় না বুঝিলে তাহাতে আস্থা হয় না, তাহা আয়ত্বাধীনে আনাও যায় না। আজ কাল বঙ্গীয় সমাজে মৃদুমন্দ ধর্ম্ম স্রোত চলিতেছে বটে—কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই স্রোতের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অতি অল্প লোকেই ডুবিয়া ভিতরের সত্য বুঝিতে সক্ষম হইতেছে। ইহাতে এই প্রধান দোষ হইতেছে যে, অন্ধবিশ্বাসের ভাগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অন্ধবিশ্বাস ধর্ম্মের অবনতির কারণ। বিকারের হাত পা ছোড়ার ন্যায় অন্ধবিশ্বাসের ভক্তি, লম্ফ ঝম্ফ। অন্ধবিশ্বাস স্থায়ী হয় না, হইলেও সত্যের সহিত অসত্যের এত মিশ্রণ করিয়া ফেলে যে অজ্ঞানের ধর্ম্মে সার অপেক্ষা অসার জঞ্জালের ভাগ বেশি হইয়া পড়ে। আমরা সাধ্যানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য গুলি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন বা পরিপোষণ করিব না। আমরা হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত অমূল্য সত্যগুলির উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিব ও ধর্ম্ম কথার আলোচনা করিব। সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিবাদ যে অজ্ঞানতা মূলক তাহা আমরা বিশদরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং যাহাতে লোকের মন হইতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণভাব তিরোহিত হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদার ভাবের উদয় হয় সাধ্যানুসারে তাহার যত্ন করিব।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

শ্রীভগবানকে নানা জাতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছে। য়ুহুদীরা তাঁহাকে জিহোবা বলে, গ্রীকেরা বলে জিয়ুস, রোমকেরা বলে জুপিটর, পারসিকেরা বলে অহুরমস্‌দ, মুসলমানেরা বলে আল্লা। সকল নামেরই অল্প বিস্তর সার্থকতা আছে; কিন্তু ভারতবাসীরা শ্রীভগবানকে যে নামে

ডাকে, সে নামটি যেমন সার্থক, এমন সার্থক অন্য কোন নামই নহে। সে নামটি 'ঈশ্বর'। সকল নামই সেই গুণাতীতের কোন না কোন গুণের অভিধান করে; কিন্তু ঈশ্বর নামটি যেমন তাঁহার স্বরূপ-অভিধায়ক, এমন কোন নামই নহে। জিহোবা শব্দে ভগবানের সত্তা লক্ষিত হয়; জিয়ুস শব্দে তাঁহার অমরত্ব, জুপিটর শব্দে তাঁহার লোক পিতৃত্ব, অহুরমস্‌দ শব্দে তাঁহার অপাপবিদ্ধত্ব এবং আল্লা শব্দে তাঁহার পূজনীয়ত্ব অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর শব্দে ভগবানের যাহা স্বরূপ,—সেই ঈশিত্ব শক্তিমত্ব প্রভুভাব প্রকটিত হয়। অতএব ভগবানের ঈশ্বর নামটিই বিশেষ ভাবে সার্থক।

এই যে শক্তিমত্ব প্রভুভাব, ইহাই ভগবানের ঐশ্বর্য্য। যে ভাবে তিনি অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—যে ভাবে তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-শক্তিমান্, সেই তাঁহার ঈশভাব, ঐশ্বর্য্য। গরুড় বাহন মহাবিষ্ণু এবং সিংহ-বাহিনী মহামায়া শ্রীভগবানের ঐ ঈশমূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে তিনি কেশীমথন মধুসূদন কৈটভ মর্দ্দন অসুর-বিনাশন, যে মূর্ত্তিতে তিনি প্রলয় পয়োধিজলে বেদের উদ্ধারক, অতি বিপুল ক্ষিতির সংস্থাপক, ত্রিপাদ পরিমাণে ত্রিভুবনের আচ্ছাদক, সুবিশাল ক্ষত্রিয় কাননের প্রচণ্ড পাবক, সেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে তিনি দশভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া পাপাসুরকে নিগড়িত নিপীড়িত বিধ্বস্ত করেন, রণাঙ্গনে ভৈরব তাণ্ডব করিয়া লেলিহান লোল-রসনায় অরাতির উষ্ণ শোণিত শোষণ করেন, বিন্ধ্যবাসিনী বিমোহিনীরূপে সিংহনাদে ভূতল গগন কাঁপাইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ মথন করেন, সেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে। শশী সূর্য্য যাঁহার নেত্রে, দীপ্তানল যাঁহার আননে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত দশন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ; যিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন সেই আদি-অন্ত-মধ্যহীন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয় কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ' মহামূর্ত্তি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত।

দর্শন শাস্ত্রে ভগবানের যে ভাব বিচারের বিষয়, সেও ঐ ঈশ্বর ভাব, ঐশ্বর্য্য। দর্শনে ভগবান সগুণ নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। নির্গুণ ভাবে তিনি

অজ্ঞেয়বাদীর অবাঙ্মানসগোচর পরমতত্ত্ব, বাক্যাতীত চিন্তাতীত জ্ঞানাতীত; উপনিষদের প্রতিপাদ্য সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, যাঁহার স্বরূপ বর্ণনে মাত্র অভাববাচক নেতি নেতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়; যাঁহার তটস্থলক্ষণে কেবল 'তজ্জলান'* শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে—তাঁহা হইতে সৃষ্টি, তাঁহা দ্বারা স্থিতি, তাঁহাতেই লয়।

সগুণ ভাবে ভগবান সকল ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য, সকল জীবের উপাস্য। ইনিই পূর্ব্বোক্ত জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর, অহুরমস্দ আল্লা। ইনিই হিন্দুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এক হইয়াও গুণ ভেদে ত্রিধা বিভিন্ন; অথবা কর্ম্মভেদে সংখ্যায় অনন্ত, তেত্রিশ কোটী। ইনিই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদে ব্যষ্টির মহাসমষ্টি ভাবে বেদান্তের প্রতিপাদিত বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর; এবং যোগ শাস্ত্রের উল্লিখিত যোগিধ্যানগম্য পুরুষ বিশেষ।

ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা বা ধারণা করিয়া উঠা যায় না। প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঐ ঐশ্বর্য্য কতকটা উপলব্ধি করা যায়। বাত্যা বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বনব্যাপী দাবানল, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, গগণ ভেদী বজ্র নির্ঘোষ, এই সকল ঘটনায় ভগবানের ঐশ্বর্য্য ঈষৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। অসীম আকাশে অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারার অনন্তকাল সঞ্চরণে; অবিশেষ নীহারিকার বিবিধ বৈচিত্রময় সৌর জগতে বিবর্ত্তনে; জড় চেতন, ব্যক্ত অব্যক্ত সাঙ্গ নিরঙ্গ স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বত্র অলংঘ্য ক্রমপরিণতি নিয়মের ব্যবস্থাপনে, ঐ ঐশ্বর্য্যের বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বিশ্বময় ভগবানের বিভূতি পর্য্যালোচনা। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং তাহার প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক ভগবানের বিভূতির সীমা নাই। তবে বোধ সুগম করিবার জন্য ভাবিতে হয় যে

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জ্জিতমেববা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্॥

---

* তজ্জলান—তজ্জ তল্ল তদন অর্থাৎ তাহা হইতে জাত তাহাতে লীন তাহা দ্বারা জীবিত।

যাহা কিছু বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও বলবৎ তাহাই আমার অংশ সম্ভূত বলিয়া জ্ঞান করিবে।

বোধ হয় ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কিছু পরিচয় দিয়াছি ; অতঃপর তাঁহার মাধুর্য্যের আলোচনা করি।

ঐশ্বর্য্য ছাড়া ভগবানের আর একটি ভাব আছে ; সেটি তাঁহার মধুরভাব, মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্যে যেমন নিয়মের কঠোরতা, মাধুর্য্যে তেমনি করুণার কোমলতা। এই ভাবে তিনি দয়াময় স্নেহময় প্রেমময় করুণাময়। এই ভাবে তিনি বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতিরূপে আত্ম বলিদান দিয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্ভাবিত করেন। এই ভাবে তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া জগতের পাপ ভার বহন করিবার জন্য আপনার প্রিয় পুত্রকে মনুষ্য লোকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে তিনি মাতা পিতা পত্নী পরিজন ছাড়িয়া শোভাময় সুখময় সংসার সুখে বিসর্জ্জন দিয়া, মানবের দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার অভিলাষে মহা সংক্রমণ করেন। এই ভাবে তিনি ভৃগুর পদাঘাতে বক্ষে তাড়িত হইয়া লক্ষ্মীর উৎসঙ্গ শয্যা হইতে ঝটিতি উঠিয়া মুনির কোমল চরণে পাছে ব্যথা লাগিয়া থাকে এই জন্য ব্যাকুলতা* প্রকাশ করেন। এই তাঁহার মধুর ভাব মাধুর্য্য। উমার আগমনী বিজয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মায়াতীত মহামায়া যখন মায়াবী মানুষের মত স্নেহ ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া পিতা মাতাকে সম্বৎসরান্তে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়েন, যখন ছল ছল চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন

এসেছেন পিতা অচল,　　আঁখি দুটি ছল ছল,
কেবল বল্‌ছেন চলচল কি আজ্ঞা হয় পশুপতি
সম্বৎসর হইল গত,　　মা আমার কাঁদিছেন কত
আসিব হে ত্বরান্বিত করি আমি এই মিনতি।

যখন জগন্মাতা মায়িকমাতার বিরহ ভয়ে বিধুর হইয়া সারা নিশি জাগিয়া

---

* প্রথম দৃষ্টিতে এই দৃষ্টান্তটি ভগবানের মাধুর্য্যের একশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রাধার "পদপল্লবমুদারম্" শিরে ধারণ করা যেন মধুরতার আর এক গ্রাম উর্দ্ধে বলিয়া মনে হয়।

বিষণ্ন ও মলিন বদনে রোদন করেন, যখন বিজয়াদশমীর দিন গিরিরাণী তাঁহার উদ্দেশে কাতরে বলেন—

জাগাওনা হর জায়ায় জয়া তোমায় বিনয় করি
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ;
নিশি জেগে কাতর হয়ে আছেন উমা ঘুমাইয়ে ;
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি ॥

তখন আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ভগবান্ শুধু ঐশ্বর্য্যশালী নহেন তিনি মধুরতাময়।

আর যখন অনাদি অনন্ত নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মায়ার মানুষ সাজিয়া উদ্ধব অক্রূরের প্রভু হয়েন, নন্দ যশোদার পুত্র হয়েন, শ্রীদাম সুদামের সখা হয়েন, ব্রজ গোপীর নাগর হয়েন ;—যখন তাঁহার দাস্য ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহার লীলাবসানের সহিত মায়িক দেহের অবসান হইবে বুঝিয়া করুণ কণ্ঠে উদ্ধব তাহার প্রভুকে বলে—

নাহং তবাঙ্ঘ্রি কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয়মামপি

হে কেশব ! আমি তোমার চরণ কমল অর্দ্ধক্ষণ ও ছাড়িতে পারিব না নাথ ! আমায়ও বৈকুণ্ঠে লইয়া চল। যখন বাৎসল্যে বিভোর হইয়া, তাঁহার বিরহে অঝোর নয়নে ঝুরিয়া যশোদা তাহার নীলমণির উদ্দেশে ডাকিয়া বলে—

অঞ্চলের মনি এসরে নীলমণি
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে
আয়রে কোলে করি হেরি চাঁদ বয়ান।

যখন সখ্য প্রীতিতে আকুল হইয়া শ্রীদাম খেলার সাথী প্রিয় সহচর অভিন্নহৃদয় রাখাল রাজার শ্রীমুখে অর্দ্ধভুক্ত ফল তুলিয়া দিয়া বলে—

বড় সুমিষ্ট এ ফল খারে কৃষ্ণ আমি খেয়েছি
মধুর ব'লে আর না খেয়ে ধড়ায় বেঁধেছি

ফল খেয়ে ভাই নাচতে হবে
নাচ্‌বো আমরা রাখাল সবে
সবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে আয় দেখি নাচি ॥

যখন প্রেমে তন্ময় হইয়া শ্রীরাধা জীবনে জীবনে জনমে মরণে তাঁহাকেই প্রাণেশ্বর ভাবিয়া আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীপদে উপহার দিয়া একতান মন প্রাণে বলে—

ভাবিয়া ছিলাম এতিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে গোকুলে দুকুলে
আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায় ॥

তখন আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝি যে ভগবান্ কেবলই ঈশ্বর নহেন, তিনি মধুময়, মধু হইতে মধুর, মাধুর্য্যঘন।

ভগবানের ঈশিত্ব শক্তিমত্ব বুঝাইবার পক্ষে যেমন ভারতবাসীর ভাষায় ঈশ্বর নাম সার্থক, তেমনি তাঁহার মধুময়ত্ব, মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য সার্থক নাম রাম, হরি, কৃষ্ণ*। রাম নামে ভগবানের মনোরম, অভিরাম, ভাবটি কেমন প্রকাশিত হয়! হরি নামে তাঁহার স্নিগ্ধকর চিত্ত হর ভাবটি কেমন অভিব্যক্ত হয়! আর কৃষ্ণ নামে তাঁহার চিত্তবিনোদন আকর্ষক ভাবটি কেমন প্রকটিত হয়!

অন্য জাতির ভাষায় এরূপ ভাবব্যঞ্জক নাম আদৌ নাই, অন্য ধর্ম্মীরা ভগবানের এ মধুর ভাব তেমন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। খৃষ্টানের ধর্ম্ম গুরু ইহুদীরা ভগবানের মাধুর্য্য লীলার কোন ধারই ধারে না, তাহাদের ঈশ্বর কঠোর কঠিন কোপনস্বভাব। তাহারা শান্তভক্তির উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। কেবল যেন ডেভিডের গীতিতে (songs of David) (যদি

* রম্ ধাতু হইতে রাম; হৃ ধাতু হইতে হরি এবং কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে ; যাহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন) মধুর ভজনের একটু সুস্পষ্ট আভাষ আছে। কিন্তু উত্তপ্ত মরুভূমিতে গোলাপ কোরকের ন্যায় ডেভিডের সেই অস্ফুট ভাব ইহুদি ধর্ম্মে ফুটিতে পায় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মে দাস্য ভক্তির বেশ পরিপুষ্টি দেখা যায়। খৃষ্টের ঈশ্বর ভক্তি দাস্য ভজনের শেষ সীমায় উন্নীত। খৃষ্ট ধর্ম্মের ছায়া অবলম্বনে মুসলমান ধর্ম্ম গঠিত। এ বিষয়ে, অনুকৃত আদর্শের উপর উঠিতে পারে নাই। মহম্মদের ঈশ্বর ভক্তি দাস্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমান্বিত। সুধু যেন হাফেজের পদাবলীতে মধুর ভজনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রমইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আর্য্য ধর্ম্মেও মধুর ভাবের বিকাশ অনেক যুগ পরে হইয়াছিল। বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগে ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়াই পূজিত। উপনিষদেও তিনি পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভাবেই আলোচিত। দর্শনে ও তাঁহার ঈশ ভাবই অনুমোদিত ; যে হেতু দর্শন তর্ক বাদ ও জল্প বিশিষ্ট উপনিষদেরই ছায়া মাত্র।

ভগবানের মাধুর্য্যের পরিপুষ্টি ও পরিণতি (আবিষ্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে) দেখিতে পাই মহাভারতে*। গীতায় (গীতা মহাভারতের অন্তর্গত) ভক্তিভাবের চরম অবস্থা।

যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোষি দদাসিয়ৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্

অশন, যাজন দান তপস্যা সকল কার্য্যের ফলই আমাকে অর্পণ কর।

ইহাই ভগবানে আত্ম সমর্পণ, নদী যেমন সর্ব্বতোভাবে সমুদ্রে আত্ম সমর্পন করে, সেই রূপ আত্ম সমর্পণ। ইহা ভক্তির এক শেষ। কিন্তু ইহার উপরও আর কিছু আছে। ভগবানকে ভক্তি করা ছাড়া তাঁহাতে যে প্রেম করা যায়, এ তত্বটি গীতায় পাই না। প্রেম ভজনের স্পষ্ট আভাষ দৃষ্ট হয় বিষ্ণু পুরাণে। আর ভাগবতে তাহার শরীরপ্রাপ্তি সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে আলোচনা এবং পরিণতির ক্রম প্রদর্শন। এ মধুর ভজন প্রণালী সংস্কৃতের দুর্ব্বোধ্যতায়

* শাণ্ডিল্য সূত্র বোধ হয় মহাভারতেও পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী ; তাহাতে ভগবানের দার্শনিক ভাবে আলোচনা আছে। ভক্তির একটী নাম শাণ্ডিল্য বিদ্যা। শাণ্ডিল্য কি ভক্তি মার্গের প্রবর্ত্তক ?

লুক্কায়িত ছিল। সাধারণের তাহার রসাস্বাদনের কোন সুযোগ ছিল না। বাঙ্গালী মহাজনেরা অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাকে সুগম করিয়া তাহার প্রচার করেন। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সুমধুর পদাবলীতে ভগবানের মধুর ভাব জীবের বোধায়ত্ত করেন। বাঙ্গালী সুস্বর তানে ভগবানের নাম গান করিয়া কবিতার সাহায্যে তাঁহার মাধুর্য্য বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু আদর্শের অভাবে ভগবানকে নাগর ভাবে ভজন তাহার কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হইত, দেহধারী রাধা সে কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পাইত না, এই সময় শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শ তাহার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যে সকল মহাভাবের প্রসঙ্গ লোকে ভাগবতে পাঠ করিয়াছিল মহাজনের পদাবলীতে সংগীত শুনিয়াছিল, সে সকল তাঁহাতে বিদ্যমান দেখিতে পায়। শ্রীরাধার যে অবস্থা সাধারণে অলীক কল্পনা মনে করিত, এখন তাহাই শ্রীচৈতন্যে বিকশিত দেখিতে লাগিল। "তিনি শয়নে স্বপনে জলে আকাশে সমস্ত সংসার কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি আর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জন ব্যতীত ত্রিজগতে কেহ আছে বা থাকিবার প্রয়োজন আছে এ বোধ তাঁহার নাই"।* তখন প্রেম ভজনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির যেরূপ পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যে আবিষ্ট হইয়া প্রেমের সেই রূপ চরম পরিণতি সাধন করিলেন। তাঁহার মাধুর্য্য উপলব্ধি জীবের তখন অতি সহজ সাধ্য হইল।

মধুর ভজনের এই সংক্ষেপে ইতিহাস। ইহার ক্রমআলোচনায় প্রবন্ধের বিষয় কিছু বিশদ হইবে এই আশায় কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে সন্নিবেশিত করিলাম। প্রেম ভজন বাঙ্গালীর অতি নিজস্বধন, অতএব বিশেষ আদরণীয় হওয়া উচিত।

অতএব ভগবানের দুই ভাব ঈশ ভাব ঐশ্বর্য্য এবং মধুর ভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি প্রকারে ভগবানের মুক্ত ভাব আয়ত্ত করিবে? ইহার কি কোন উপায় আছে? পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* শ্রীশিশির কুমার ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত।

ভক্তি-তত্ত্ব।

প্রণম্য পরমং দেবং শ্রীগোপীজনবল্লভম্।
তৎপাদপ্রাপিকা ভক্তিঃ সূত্রৈর্বিব্রিয়তে ময়া॥

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুসারে, অনাদি-শ্রীভগবদ্বৈমুখ্য-জন্য যে মায়ারচিত সংসার ও সংসারীর দেব-মানবাদি-ভাব তাহাকে শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীহরির দাসভূত জীব অণুবিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃসুখস্বরূপ যে নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিতি করেন তাহাকেই মুক্তি বলা যায়। এতদ্দ্বারা অংশভূত জীব যে অংশী পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হয়েন, তাহাও মুক্তি বলিয়া উপলক্ষিত হইল।

জীব অনাদিকাল হইতে ভোগবাসনায় আবদ্ধ অতএব ভগবদ্বিমুখ হইয়া কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। ঐ বৈমুখ্যরূপ ছিদ্র অবলম্বন করিয়া মায় তাঁহার ভগবদ্বিস্মৃতির সহিত আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়া দিয়া তাঁহাকে স্বরচিত সংসারে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ঐ সংসারে অব্যক্ত খনিজ জীব-ভাবে এবং উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত উদ্ভিজ্জাদি চতুর্বিধ জীবভাবে পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ বিষয় সকল ভোগ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মবন্ধন।

উক্ত বন্ধনের অবস্থায় জীবের দেহে ও দৈহিক পদার্থ সকলে একটি 'অহঙ্কার' ও 'মমকার' অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার অভিমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অভিমান যেমন কামক্রোধাদির উৎপাদন দ্বারা জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ হয়, তদ্রূপ উহাই আবার তাঁহার দেহ-দেহি-ভেদ-জ্ঞানের উৎপাদন দ্বারা সংসারমোচনেরও হেতু হইয়া থাকে। উহাই বিবেকের বীজ। ঐ বীজের বিকাশ মানবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য কোন জীবে হয় না। কোন কোন ইতর জীবে সংস্কাররূপে বিবেকের আভাস লক্ষিত হইলেও মানব ভিন্ন অপর কোন জীবেই উহার পূর্ণ বিকাশ শ্রবণ করা যায় না। মানবে বিবেকের পূর্ণ বিকাশও আবার এক দিনে হয় নাই। শত শত জীব-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মানব বিবেকের পূর্ণবিকাশোপযোগী মনুষ্য-

দেহ প্রাপ্ত হইয়া উহা লাভ করিয়াছেন। মানবের এমন কত শত জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, যে সকল জন্মে বিবেক ত দূরের কথা, তিনি অকিঞ্চিৎকর নির্বিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্রের জ্ঞানও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। পরে তিনি নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রকাশোপযোগী দেহ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে মানব সবিকল্পক জ্ঞানের অর্থাৎ বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের এবং বিচারের উপযোগী দেহও প্রাপ্ত হইলেন। ঐ দেহের প্রাপ্তিতে মানবের বিবেকশক্তি পূর্ণভাবেই বিকাশিত হইল।

বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। উহাই প্রথম জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন দ্বারা জ্ঞানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া এইরূপে জ্ঞানরূপে অনুভূত হইলেও তৎকালে ঐ জ্ঞান যে কোন্ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইল এই বিশেষটি জানা থাকে না বলিয়াই তাদৃশ জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা যায়। বিশেষজ্ঞান মনের কার্য্য, এবং ঐ বিশেষজ্ঞানকেই সবিকল্পক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। সবিকল্পক জ্ঞানের উৎপাদনে কেবল স্থূল শরীরের ক্রিয়াই যথেষ্ট নহে; উহাতে সূক্ষ্ম শরীরেরও ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। বাহ্যবস্তুর সংযোগে উৎপন্ন যে স্থূলশরীরের ক্রিয়াবিশেষ, যাহা প্রথমেই নির্বিকল্পক জ্ঞানের আকারে আকারিত ও অনুভূত হইয়াছিল, তাহাই আবার সূক্ষ্মশরীরে 'ইহা অমুক বস্তুর জ্ঞান' এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞানরূপে অনুভূত ও সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই প্রকার মানসিক কার্য্য কোন কোন ইতর জীবেও লক্ষিত হইয়া থাকে। মানবের মানসিক কার্য্য ইহা হইতেও বিলক্ষণ। মানব বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ ব্যতিরেকেও কেবল মনোগত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অনেক জ্ঞানকার্য্যই সংসাধন করিতে পারেন। মনোগত মানসিক ভাব সকলকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাগ করা, তদ্রূপে বিভক্ত বিষয় সকলের পরস্পর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অবধারণ পূর্ব্বক বস্তুর বিচার করা ও পরে ঐ বিচারিত বিষয় সকলের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের নির্ণয় দ্বারা কারণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত বিচারের উপসংহার করা সম্পূর্ণ মানবীয় কার্য্য। সত্য বটে, স্থূলশরীরের সাহায্যেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্দ্বারাই মানবের স্থূলশরীর হইতে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য বস্তুর

সংযোগে স্থূলশরীরের স্থূলাংশ সঞ্চালিত হইল। কিন্তু ঐ সঞ্চালনকে জ্ঞান বলিয়া অনুভব করিল কে? ইন্দ্রিয়সমূহে কার্য্যকারী আত্মাই উহাকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানরূপে অনুভব করিলেন। আবার সূক্ষ্মশরীরে কার্য্যকারী আত্মাই উহাকে সবিকল্পক জ্ঞানের আকারে আকারিত করিলেন। পরে ব্যষ্টি-সমষ্টি-জ্ঞানের উৎপত্তিতে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। এই সকল কার্য্য কখনই সংস্কারবলে হইতে পারে না। উহার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ জ্ঞানবানের কার্য্য লক্ষিত হইতেছে। অতএব ঐ বিচারকার্য্যেই যে আত্মার জ্ঞানশক্তির —বিবেকশক্তির পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হইতেছে ইহা স্থির। এই বিবেকশক্তির জন্যই মানব স্বকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হইয়াছেন, এবং ইহা না থাকাতেই অপরাপর জীব তাহাদিগের কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী নহে।

বিবেকশক্তিসম্পন্ন মানব উক্ত দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াই জন্মজন্মান্তরে নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ঐ জন্মান্তরও অবশ্য স্বীকার্য্য! উহার অস্বীকারে মানবের দশাবিপর্য্যয় আকস্মিক হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার উক্ত দশাবিপর্য্যয়কে কোনরূপেই আকস্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; যেহেতু তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। যোগজ জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেও অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক প্রমাণের প্রামাণ্য কখনই অপলপিত হইতে পারে না। মানবের বর্ত্তমান অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, উহা যে পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া রহিয়াছে, তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়।

জন্মজন্মান্তরে স্বকৃত কর্ম্মের ফল সকল ভোগ করিতে করিতে যখন যে ভাগ্যবান মানবের ঘোরতর মায়ানিদ্রার আবেশ একবার ভঙ্গ হয়, তখন সেই মানব আবার ধীরে ধীরে শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হইতে থাকেন; অর্থাৎ তৎকালে সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার জন্মান্তরের প্রতি লক্ষ্য হয়, এবং তদনন্তর ক্রমশঃ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়প্রকার কর্ম্মফলের অসারত্ববোধের সহিত যে পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি হয় সেই পরিমাণেই শ্রীভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে। ঐ শ্রদ্ধাই সাম্মুখ্য বা সাম্মুখ্যের প্রথম সোপান। এইরূপে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হইলে জীবের মায়াবরণ আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। মায়াবরণ উন্মুক্ত হইলে, দেহাদিতে অহঙ্কারাদির বিলোপে আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার

লাভ হয়। একবার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে, আর জীব অস্বরূপে অবস্থান করেন না। অতএব তৎকালেই তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তিতে সেবাপ্রাপ্তি বিশেষ-সৌভাগ্য-সাপেক্ষ।

জীবের স্বরূপ অণুবিজ্ঞানাত্মক ও দুঃখশোকাদিরহিত। তিনি স্বয়ং সুখরূপ ও শ্রীহরির দাসভূত অর্থাৎ সম্পূর্ণ তদধীনস্থ তৎসেবক। তিনি পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ এবং উপাধিভেদে বিভিন্ন। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জীবোপাধি বা জীবদেহ। মানবদেহ যাহাকে আমরা আপাততঃ নির্জীব জড়পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করি, উহা বাস্তবিক তদ্রূপ নহে। উহাও সজীব পরমাণুসমষ্টি দ্বারা সংগঠিত। ঐ দেহ আবার একটি নহে; উত্তরোত্তর তিনটি। কিন্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অতএব ব্যাপক ঐ দেহত্রয়কে আপাততঃ একটি দেহ বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে। মানবের পরিদৃশ্যমান দেহের নাম স্থূলশরীর। স্থূলশরীরের পরবর্ত্তী শরীরের নাম সূক্ষ্মশরীর, এবং তৎপরবর্ত্তী শরীরের নাম কারণশরীর। সূক্ষ্মশরীর যেমন স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম এবং উহাকে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ কারণশরীরও আবার সূক্ষ্মশরীর হইতে সূক্ষ্ম এবং উহাকে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে ব্যাপিয়া আছে। উক্ত তিনটি শরীরই পরমাণুময়। এবং প্রত্যেক শরীরের প্রত্যেক পরমাণুই সজীব। মানবাত্মা ঐসকল পরমাণুতে অধিষ্ঠিত জীবসমূহের অধিনায়ক। প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির নিয়মে সমুন্নত অতএব আত্মশক্তির সম্যক্ বিকাশের উপযুক্ত মানবদেহে অধিষ্ঠিত মানবাত্মা নিজের ক্রমপরিবর্দ্ধিত শক্তি দ্বারা—বাসনা দ্বারা কেন্দ্রস্থ হইয়া সজীব দৈহিকপরমাণুসমূহের সমষ্টিভূত কার্য্যকে নিজের কার্য্য এবং উহাদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। মায়াবৃত মানব নিজের ঔৎপত্তিক দাসভাব—স্বাভাবিক সেবকভাব বিস্মৃত হইয়া ঔপাধিক অহংভাবে—অস্বাভাবিক অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে সুখসমষ্টি বা দুঃখসমষ্টি ভোগ করিতে থাকেন, তাহা যে তাঁহার নিজের নহে, পরন্তু ঔপাধিক, তাহা তিনি স্বয়ং হঠাৎ বুঝিতে সমর্থ হয়েন না। কোন গতিকে বুঝিলেও উক্ত ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হওয়া আবার অত্যন্ত দুর্ঘট। মানবের নিজকৃত কর্ম্মই তাঁহার ঔপাধিক ধর্ম্মকে সহজ ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়াছে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা উক্ত

ধারণার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। জ্ঞান দ্বারা ঔপাধিকত্ব বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট হইল না। উপাধিকে উপাধি বলিয়া বুঝিলেইত উপাধির নিবৃত্তি হইল না। উপাধির নিবৃত্তির নিমিত্ত উপাধি-সম্বন্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তির প্রয়োজন হইবে। জবাকুসুমের সন্নিধানে স্ফটিকের ঔপাধিক লৌহিত্য জন্মে। স্ফটিক যদি চেতন হয়, তাহা হইলে, সে, ঐ লৌহিত্য তাহার নিজের নয়, পরন্তু জবাকুসুমের সান্নিধ্য বশতঃ তাহার একটি ঔপাধিক লৌহিত্য জন্মিয়াছে, ইহা জানিতে পারে; কিন্তু ঐ সান্নিধ্যের অত্যন্তোচ্ছেদ ব্যতিরেকে উপাধির বা ঔপাধিক লৌহিত্যের নাশ হইতে পারে না। জীবের সম্বন্ধে—মানবের সম্বন্ধেও ঐ কথা। মানবের মায়াসম্বন্ধের—মায়োপাধিকৃত অহঙ্কারাদির অত্যন্তোচ্ছেদ ভিন্ন তাঁহার সংসারদশার—বন্ধনদশার বিলোপ হইতে পারে না। আবার সংসারে কোন বস্তুরই আত্যন্তিক নাশ নাই। অতএব মায়ায় বা মায়ারচিত সংসারেরও আত্যন্তিক নাশ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি কোন এক স্বরূপে ঐ ঔপাধিক অহঙ্কারকে ও মমতাকে অর্পণ করিতে পারা যায়; অর্থাৎ যদি কোনপ্রকারে প্রকৃত অহংপদার্থে অহঙ্কারকে এবং প্রকৃত মমতাস্পদে মমতাকে স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মানব বন্ধনদশা হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন। মানব যদি অংশভূত অণুচৈতন্যকে অংশী বিভুচৈতন্যে শক্তিভূত জীবাত্মাকে শক্তিমান্ পরমাত্মাতে এবং প্রাকৃতিক মমতাকে অপ্রাকৃতিক মমতায় অর্পণ করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্ত হইতে পারেন। মানব "আমি কর্ত্তা" ভাবিয়াই নিজের বন্ধন নিজেই আনয়ন করিয়াছেন। তিনি যদি আবার কোন উপায়ে ঐ স্বকর্ত্তৃত্ব ভুলিতে পারেন, তিনি যদি কোন উপায়ে মহান্ কর্ত্তার মহৎ কর্ত্তৃত্বে ক্ষুদ্র আত্মকর্ত্তৃত্ব সমর্পণ করিতে পারেন। তিনি যদি কোন উপায়ে অলক্ষিত ঐশী চেষ্টাতে আত্মচেষ্টাকে সমর্পণ করিতে পারেন, তবেই তিনি এই দুরত্যয় মায়াবন্ধন হইতে দুশ্ছেদ্য কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তিনি যদি কোন সদুপায়ে নিস্বার্থ মহান প্রভুর প্রভুত্বে স্বার্থযুক্ত আত্মপ্রভুত্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ক্ষুদ্র দাসভাব সার্থক করিতে পারেন, তবেই তিনি এই ঘোর মায়াপাশ ভীষণ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, অন্যথা নহে।

মানব যে উপায় অবলম্বনে মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, যোগই সেই উপায়। ঐ যোগ তিন প্রকার, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। যোগশব্দের অর্থ কৌশল। অতএব যে কৌশলে কর্ম্মদ্বারা মায়াপাশ ছেদন করা যায়, তাহার নাম কর্ম্মযোগ, এবং যে কৌশলে জ্ঞান দ্বারা মায়াপাশ ছেদন করা যায়, তাহারই নাম জ্ঞানযোগ। কর্ম্ম ও জ্ঞানকে ভক্তির সহিত যুক্ত বা ভক্তির অঙ্গীভূত করিয়া লওয়াই ঐ কৌশল। কারণ, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির সহিত যুক্ত বা ভক্তির অঙ্গীভূত না হইলে, উহারা স্বতন্ত্রভাবে মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি সকাম তিনিই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সকাম কর্ম্ম দ্বারা কখনই মায়াপাশের ছেদন হইতে পারে না। আবার যিনি কৈবল্যমাত্র কামনায় সকল বিষয়ে নির্ব্বিন্ন তিনিই জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞানীও কৈবল্যকাম হইয়া সকাম হয়েন। অতএব তাদৃশ অধিকারীর পক্ষেও মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান যখন ভক্তির সহিত যুক্ত বা উহার অঙ্গীভূত হয়, তখন উহাদের মূলে ভক্তিকামনা বা মুক্তি-কামনা কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং তখনই উহারা মায়াপাশ ছেদনের পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, কর্ম্মবন্ধন মোচনের অন্য নিরপেক্ষ উপায় একমাত্র ভক্তিযোগকেই স্থির করিতে হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

মুক্তি।

তোমার শান্তির কোলে এসেছি জননী গো
চাহিতে একটু খানি স্থান।
(তব), অসংখ্য সন্তান সাথে আমিও এসেছি আজি
পাইতে স্নেহের কণা দান॥
(হেথা), নিভৃতে নিশ্চিন্তে রহি করিব বাসনা মনে
জীবনের দিন অবসান।

ক্ষুদ্রতার সীমা কাটি অনন্তের সাথে মোর
বিলীন করিয়া দিব প্রাণ॥
আসিবেনা এতদূরে ভাসিয়া আর সে ক্রূর
সংসারের বিষময় বায়।
সিন্ধু ব্যবধান মাঝে, ও পারের কোলাহল
কাণে আর শোনা নাহি যায়॥
কিসের মমতা? হায়, আছে কি গো সংসারের
কোন খানে একটু হৃদয়?
জীবের শোণিত পায়ী রাক্ষসী প্রতিমা সেতো
পরাণ তাহার স্বার্থ ময়॥
ছলে বলে সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করা
এই শুধু উদ্দেশ্য তাহার।
প্রশমিত কোন কালে কভু নহে হইবার
বহ্নি সে দারুণ আকাঙ্ক্ষার॥
"দাও দাও" সদা তার শুধু এই কথা মুখে
এক তিল নাহিক বিরাম।
বলিনা এমন কথা, কখনো সে নাহি দেয়
গ্রহণ করিয়া প্রতি দান॥
মথিয়া জীবন সিন্ধু গ্রহণ করিয়া সুধা
পরিপূর্ণ করে হলা হলে!
দেবতা মন্দির ভাঙি, গড়ে সে শ্মশান নিজ
বিলাস প্রসাদ কুতুহলে;
ক্ষেত্রের উর্ব্বরসা নাশি কঠিন নীরস বক্ষ
মরুভূমে করে পরিণত;
ঘোর অত্যাচারে তার জীবের হৃদয় হ'তে
নির্ব্বাসিত সুপ্রবৃত্তি যত॥
অভাব অশান্তি শুধু মেলিয়া সহস্র জিহ্বা
মানবেরে সদা গ্রাস করে।

নরক কোথায় আর? নিত্য অভিনয় তার
　　হইতেছে চক্ষের উপরে॥
নির্দ্দয় পাষাণী সেই কি কুহক মন্ত্রবলে
　　সৃষ্টি নাশ করে বিধাতার।
পড়িলে বারেক ধরা, নিষ্কৃতি নাহিক ত্বরা
　　ভীষণ কবল হ'তে তার॥
দুর্ল্লভ, মানব হেন, তার প্রলোভন ফাঁদে
　　স্খলিত হয়নি যার পদ।
একটী দিনেরো তরে সকলেরি তার কাছে
　　লিখি দিতে হয় দাস্য খত॥
(তবে,)—ত্বরায় সে লভে মুক্তি সংগ্রামে জিনিয়া তারে
　　আছে যার হৃদয়ের বল।
নহিলে দাসত্ব চির, জীবের জনম ধরি।
　　ললাটের লিখন কেবল॥
(আজি) ফেলেছি ভাঙ্গিয়া আমি শত জনমের মম
　　অধীনতা শৃঙ্খলের ভার।
আজি আর নিয়ামক প্রভু নহে সে আমার
　　আজি আমি দাস নহি তার॥
পেয়েছি ফিরিয়া আজি হারান সে স্বাধীনতা
　　উদার বিমুক্ত বুকে তব
আজি কে তোমার ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্বের মাঝে
　　জন্মিনু জীবনে অভিনব॥
(তব.) যথা রবি শশী তারা কুসুম সলিল তরু
　　(এবে,) আমিও তাদেরি একজন।
হইব তাদেরি মত নিখিলের আপনার
　　করি ব্রত নিষ্কাম সাধন।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

প্রকৃতি।

প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ এই ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন প্রকৃতি শব্দের অর্থ জগৎ-সৃজনকর্ত্রী অর্থাৎ যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহার নাম প্রকৃতি। বেদ স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি দ্বারাও এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়, যথা——

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্ত মহেশ্বরঃ
ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা ইত্যাদি

অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি শব্দ প্রতিপাদ্য জানিবে; ঐ মায়াশ্রয়কেই মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর জানিবে; মায়া হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়, মায়াশ্রয়ত্ব রূপেই পরমেশ্বরের পরমৈশ্বর্য্য, ইহাই সর্ব্ববেদসম্মত। সুতরাং মায়া ও প্রকৃতি এই উভয় শব্দের বেদসম্মত একত্বে প্রকৃতি শব্দার্থ জগৎসৃজনকর্ত্রী এবং পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত আর বুদ্ধি মনঃ অহঙ্কার এই বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত আটটি পদার্থ আমার প্রকৃতি জানিবে। ভগবদ্গীতার এই ভগবদ্বাক্য দ্বারাও প্রকৃতি শব্দার্থ জগৎকর্ত্রী ইহাই সুপ্রতিপন্ন হয় যেহেতু পরমেশ্বরের এই আট প্রকার জড় প্রকৃতি দ্বারাই জড় জগৎ নির্ম্মিত প্রতিভাত হয়। লৌকিক ব্যবহারে প্রকৃতি শব্দার্থ স্বভাব, যথা বহ্নির উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা, জলের শীতলতা ও তরলতা। স্বভাব শব্দের অর্থ স্বসত্তা, বহ্নির উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা জলের শীতলতা ও তরলতা ভিন্ন আর সত্তা কি? সুতরাং উষ্ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মই বহ্নি ও জলের বাস্তবিক উপাদান লোকে স্বভাব অথবা প্রকৃতি নামে ব্যবহৃত হয়। এবং চেতন সম্বন্ধে স্বভাব অর্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার যথা—ভরতের প্রকৃতি অতি সুন্দর, রাবণের প্রকৃতি অতি কুৎসিত। এস্থলে ভরতের স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও রাবণের স্বভাবের অপকৃষ্টতা প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং ভরত সৌন্দর্য্যগঠিত, রাবণ অপকৃষ্টতা গঠিতই প্রতীয়মান হয়। অতএব বৈদিক ও লৌকিক অর্থের আলোচনায় প্রকৃতি শব্দের জগৎকর্ত্রীত্বরূপ অর্থই স্থির-সিদ্ধান্ত হয়। যেরূপ বেদান্তাদি শাস্ত্রে প্রকৃতিই এই অসীম জগতের উপাদান, প্রকৃতি দ্বারাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব উচ্চৈঃস্বরে গীয়মান দেখিতে পাওয়া যায়;

এইরূপ ব্যবহারিক অর্থের অনুসরণেও ঐ অর্থই দৃষ্ট হয় ;—যথা বহ্নির উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা বহ্নির স্বভাব অথবা প্রকৃতি, এইরূপ যাবতীয় চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান পদার্থের উজ্জ্বলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম স্বভাব অথবা প্রকৃতি। এইরূপে সমস্ত পদার্থের বিচার করিলে স্বভাব দ্বারাই সকল পদার্থ সুগঠিত, স্বভাবই জড় জগতের উপাদান, স্বভাবকে পৃথক্ করিলে পদার্থ কিছুমাত্রই থাকে না। যেরূপ বহ্নিকে উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা হইতে পৃথক্ করিলে কিছুমাত্র উহার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতাই বহ্নির উপাদান, উহাদ্বারাই বহ্নি বিনির্ম্মিত, উহাকেই বহ্নির প্রকৃতি সৃজনকর্ত্রী বলা হয়, এইরূপ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতির গঠন স্বভাব অথবা প্রকৃতি দ্বারা ; *তাদৃশ স্বভাবই তাহাদের উপাদান, তাদৃশ প্রকৃতি হইতে তাহাদিগকে পৃথক্* করা যায় না। পৃথক ভাবে চিন্তা করিতে গেলে কিছুমাত্র তাহাদের অস্তিত্ব বুদ্ধিস্থ হয় না সুতরাং উহাকেই পরমেশ্বর শক্তি অথবা প্রকৃতি বলা য়। একস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ই ভগবদ্বাক্যই বিশেষ প্রমাণ। ভগবদ্বাক্যের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যের প্রভাস্বরূপ আমি র্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের উজ্জ্বলতাস্বরূপ প্রভাই আমার প্রকৃতি অথবা শক্তি। এই প্রকৃতিই চন্দ্র সূর্য্যের উপাদান উহাদ্বারাই চন্দ্র সূর্য্য গঠিত জানিবে। এবং স্বভাবও যাবদ্দ্রব্য স্থায়ী। এই যুক্তি দ্বারা স্বভাবই জগতের উপাদান বুঝায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত যে পদার্থ থাকে তাহার স্বভাব ও সেই পর্য্যন্ত থাকে ; সেই পদার্থ নাশে তাহার স্বভাব ও নাশ হয় ; অর্থাৎ স্বভাব অথবা প্রকৃতি ভিন্ন অপর পদার্থ কিছুই নাই। অতএব পদার্থ নাশেই স্বভাবের নাশ অথবা স্বভাবের নাশে পদার্থ নাশ বলাযায়। যেরূপ সূত্রের নাশে অথবা বস্ত্রের নাশে সূত্রের নাশ হয় এই উভয়ই যুক্তি সঙ্গত অতএব সেই সেই পদার্থের প্রকৃতি স্বরূপ ঈশ্বর শক্তি মূলপ্রকৃতি পরিণত হইয়া এই ভূধর গগণ জল, নদী তরু গুল্ম লতা প্রভৃতি স্থূল জগৎ স্বরূপে বিকশিত হইতেছে। এবং ভরতের সৎস্বভাব রাবণের অসৎস্বভাব ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারেও ঐ অর্থই যুক্তি পূর্ণ। যথা সৎ স্বভাব বা সৎ প্রকৃতি এই উভয় শব্দার্থ সদুপাদান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপাদান দ্বারা এই পদার্থ গঠিত ; অসৎ স্বভাব বা অসৎ প্রকৃতি এই উভয় শব্দার্থ অসদুপাদান অর্থাৎ অপকৃষ্ট উপাদান দ্বারা এই পদার্থ গঠিত বুঝায়। এই

পরমেশ্বর মায়া বিরচিত জগন্মণ্ডলে সত্ত্বগুণই উৎকৃষ্ট উপাদান কারণ; এই উপাদান বিরচিত বস্তুকেই সাত্ত্বিক বা উৎকৃষ্ট বলে রজোপূর্ণ ও তমোপূর্ণ অপকৃষ্ট উপাদান কারণ উহাদ্বারা গঠিত বস্তুকে রাজসিক ও তামসিক বা অপকৃষ্ট বলে। সত্ত্বরজঃ তমোপূর্ণ ঈশ্বর প্রকৃতিই সেই সেই পদার্থের উপাদান রূপে পরিণত হইয়া সেই সেই পদার্থের স্বভাব বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হয় অতএব এই বিকাশ জগতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ স্বভাবের অতিরিক্ত বস্তু উপলক্ষিত হয় না। ঐ স্বভাব বা প্রকৃতিকে বস্তু হইতে পৃথকরূপে চিন্তা করিলে পদার্থের সত্বা কিছুমাত্রই থাকে না, ইহা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তানুসারে সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবই সমস্ত জীবনিবহের দেহ নিবহের উপাদানকারণ, এ উপাদান ভিন্ন দেহ আর কিছুই নয়। ঐ উপাদান দ্বারাই দেহ সুগঠিত হয়। উপাদানানুসারেই জীবের প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি দর্শনে উহাদের স্বভাব বা প্রকৃতি নিরূপিত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মানুসন্ধানে লোক নিরূপিত স্বভাবকেও প্রকৃতি বা জগতের উপাদান কারণ বলা যায়। সুতরাং এই বিশ্বব্যাপিনী ভগবৎ প্রকৃতি সত্ত্বরজঃ তমোময়ী এই প্রকৃতি অবলম্বনেই পরমেশ্বরের পরমৈশ্বর্য্য প্রস্ফুরিত হয়। এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ উর্দ্ধাধোভাবে জন্ম ধারণ করতঃ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন প্রকৃতি অভিমানেই জীবের বন্ধ ও তাপত্রয়ের অনুভব; এই প্রকৃতির অভিমান ত্যাগেই জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি জানিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীশীতলচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীবৃন্দাবন।

মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ দূরে যেখানে যমুনার দক্ষিণ তট বক্র হইয়া উপদ্বীপাকার ধারণ করিয়াছে, সেই খানে হিন্দুর পরম পবিত্র পুণ্যধাম বৃন্দাবন অবস্থিত। বৈষ্ণব জগতে এ হেন পুণ্যধাম আর কোথাও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যনিকেতন প্রমোদকানন বলিয়া ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা ভক্ত

বৈষ্ণবের নিকট মহাপুণ্যপ্রদ, প্রীতিপ্রদ এমন কি ষড়ৈশ্বর্য্যপ্রদরূপে সমাদৃত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, ভক্ত ব্যতীত বৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝিতে পারে সাধ্য কি? যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই যে ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান না করিয়াছেন, সে বৃন্দাবনের কথা কিরূপে বুঝিবে? বুঝাইতে পারে তাই বা সাধ্য কার আছে? এখানে ভগবান্ যে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়! গোপগোপীগণের সেই ঐকান্তিকী ভক্তি কৃষ্ণ-প্রীতি আত্মোৎসর্গ অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, ও অপার্থিব! ভক্ত ভাবুক এখনও স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন, বৃন্দাবনের প্রকৃতি কৃষ্ণবিরহে বিধুরা, বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যেন শ্যামের বিরহে ম্রিয়মাণ! ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দাবনের চিত্র সামান্যতঃ এইরূপ দেখিয়া থাকেন! তাঁহারা যেরূপ ভাবে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, আমাদের সেরূপ ভাবে বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা দর্শকের সমক্ষে মোটামুটী বৃন্দাবনের যে আলেখ্য উপস্থিত হয়, সেই স্থূল চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে জানা উচিত, বৃন্দাবন নাম কেন হইল?

বৃন্দাবন নামোৎপত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে * বিবৃত হইয়াছে,—

সত্যযুগে সপ্তদ্বীপেশ্বর কেদার নামে এক সত্যধর্ম্ম পরায়ণ রাজা ছিলেন। ভার্য্যা ও পুত্রপৌত্রাদি সহ মহাসুখে বাস করিতেন। পুত্রবৎ সকল প্রজাকে পালন করিতেন। ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া নানাবিধ পুণ্যকর্ম্ম

* "পুরা কেদারনৃপতিঃ সপ্তদ্বীপপতিঃ স্বয়ম্।
আসীৎ সত্যযুগে ব্রহ্মন্ সত্যধর্ম্মরতঃ সদা॥ ১৯৫॥
স রেমে সহ নারীভিঃ পুত্রপৌত্রগণৈঃ সহ।
পুত্রানিব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পালয়ামাস ধার্ম্মিকঃ॥ ১৯৬॥
কৃত্বা শতক্রতুং রাজা লেভে ত্বিন্দ্রত্বমীপ্সিতম্।
কৃত্বা নানাবিধং পুণ্যং ফলাকাঙ্ক্ষী ন চ স্বয়ম্॥ ১৯৭॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপূর্ব্বকম্।
কেদারতুল্যো রাজেন্দ্রো ন ভূতো ভবিতা পুনঃ॥ ১৯৮॥
পুত্রেষু রাজ্যং সংন্যস্য প্রিয়াং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
জৈগীষব্যোপদেশেন জগাম তপসে বনম্॥ ১৯৯॥

ও শত যজ্ঞ করিয়া বাঞ্ছিত ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই রাজেন্দ্র কেদারের মত আর হয় নাই বা আর হইবে না। তিনি জৈগীষব্য ঋষির উপদেশে ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমপত্নীকে রাখিয়া ও পুত্রের উপর রাজ্য-ভার দিয়া তপস্যার্থ বন গমন করেন। তিনি হরির একান্ত ভক্ত, যেখানে সুদর্শন চক্র বিদ্যমান, সেইখানে বহুকাল হরিধ্যান করিয়া গোলোকধামে গমন করেন। সেই স্থানের এখন কেদারতীর্থ নাম হইয়াছে। এখনও তথায় মৃত ব্যক্তি সদ্য সদ্য মুক্ত হইয়া থাকে। কমলার অংশে জন্ম বৃন্দা নাম্নী তপস্বিনী কেদারের কন্যা। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে দুর্ল্লভ হরিমন্ত্র দিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার ভাল লাগিত না, সেই জন্য বনে গিয়া নির্জ্জনে ষাটি হাজার বর্ষ তপস্যা করেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন এবং প্রসন্নমুখে "বর নাও" বলেন। সেই শান্ত সুন্দরমূর্ত্তি রাধিকাকান্তকে দেখিয়া বৃন্দা কামাতুরা হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। (মূর্চ্ছান্তে ভগবান্‌কে সন্দে- ...

হরেরৈকান্তিকো ভক্তো ধ্যায়তে সন্ততং হরিম্।
শশ্বৎ সুদর্শনং চক্রমস্তি যৎসন্নিধৌ মুনে॥ ২০০॥
চিরং তপ্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো গোলোকঞ্চ জগাম সঃ।
কেদারনামতীর্থং তত্তন্নাম্না চ বভূব হ॥ ২০১॥
তত্রাদ্যাপি মৃতঃ প্রাণী সদ্যো মুক্তো ভবেৎ ধ্রুবম্।
কমলাংশা তস্য কন্যা নাম্না বৃন্দা তপস্বিনী॥ ২০২॥
দত্তং দুর্ব্বাসসা তস্যৈ হরের্মন্ত্রং সুদুর্ল্লভম্॥ ২০৩॥
সা বিরক্তা গৃহং ত্যক্ত্বা জগাম তপসে বনম্।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুনির্জ্জনে॥ ২০৪॥
আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণস্তৎপুরো ভক্তবৎসলঃ।
প্রসন্ন বদনঃ শ্রীমান্ বরং বৃণ্বিত্যুবাচ সঃ॥ ২০৫॥
দৃষ্ট্বা সা রাধিকাকান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্।
মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ্য সা সদ্যঃ কামবাণপ্রপীড়িত॥ ২০৬॥
সা চ শীঘ্রং বরং বব্রে পতিস্ত্বং মে ভবেতি চ।
ওমিত্যুক্ত্বা চ রহসি চিরং রেমে তয়া সহ॥ ২০৭॥
সা জগাম চ গোলোকং কৃষ্ণেন সহ কৌতুকাৎ।
রাধাসমা সা সৌভাগ্যাৎ গোপীশ্রেষ্ঠা বভূব হ॥ ২০৮॥
বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্।
বৃন্দা যত্র কৃতা ক্রীড়া তেন বা মুনিপুঙ্গব॥" ২০৯॥
(শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৭ অঃ)

† অথান্যচ্চেতিহাসঞ্চ শৃণুষ্ব বৎস পুণ্যদম্।
যেন বৃন্দাবনং নাম নিবোধ কথয়ামি তে॥ ২১০॥

করিয়া কহিলেন), তুমি আমার পতি হও। ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া তোমার সহিত রমণ করিব। তখন বৃন্দা কৃষ্ণের সহিত কৌতুকে গোলাক-ধামে গমন করিলেন। রাধার সমান সৌভাগ্যক্রমে তিনিও গোপীশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। যেখানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন ও যেখানে তিনি কেলি করিয়াছিলেন সেই স্থান বৃন্দাবন নামে খ্যাত।

এ সম্বন্ধে আর একটী পুরাণাখ্যান আছে।—রাজা কুশধ্বজের তুলসী ও বেদবতী নামে দুই কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের সংসারের প্রতি আদৌ মায়া মমতা ছিল না। বেদবতী তপস্যা প্রভাবে নারায়ণকে প্রাপ্ত হন। তিনিই জনক-কন্যা সীতা নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হইয়াছেন। তুলসীও শ্রীহরিকে পতিলাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া দৈবাৎ দুর্ব্বাসার অভিশাপে ভূতলে আসিয়া শঙ্খা-সুরের পত্নী হইলেন। শাপমোচন হইলে তিনি আবার কান্ত কমলাকান্তকে প্রাপ্ত হন। তাঁহার তপস্যাস্থানও পণ্ডিতেরা বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন।

কুশধ্বজস্য কন্যে দ্বে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদে।
তুলসীবেদবত্যৌ চ বিরক্তে ভব কর্ম্মণি ॥ ২১১ ॥
তপস্তপ্ত্বা বেদবতী প্রাপ নারায়ণং পরম্।
সীতা জনককন্যা সা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২১২ ॥
তুলসী চ তপস্তপ্ত্বা বাঞ্ছাং কৃত্বা হরিং পতিম্।
দৈবাদ্দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ প্রাপ্য শঙ্খাসুরং পতিম্ ॥ ২১৩ ॥
পশ্চাৎ সংপ্রাপ কমলাকান্তং কান্তং মনোহরম্ ॥ ২১৪ ॥
তস্যা নামান্তরং বৃন্দা তদিদঞ্চ তপোবনম্।
তেন বৃন্দাবনং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥" ২১৭ ॥

‡ রাধার ষোড়শ নাম এই—
"রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী ॥ ২২৫ ॥
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী।
চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্র নিভাননা ॥ ২২৬ ॥
কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী।"
(ব্রহ্মবৈ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ১৭ অ:)

§ "অথবা তে প্রবক্ষ্যামি পরং হেত্বন্তরং শৃণু।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে ॥ ২১৮ ॥
রাধা ষোড়শ নাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥ ২১৯ ॥
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা।
ক্রীড়ার্থ ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥" ২২০ ॥
(কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৭অ:)

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে পরেও লিখিত আছে,—বৃন্দাবন নাম হইবার আরও হেতু আছে। তাহাতে বলিতেছি শ্রবণ কর। রাধার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা নামও একটী শুনা যায়, তাঁহারই কেলিকানন বলিয়া রমণীয় বৃন্দাবন এই নামে খ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রীতির জন্য গোলোকে বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রীড়ার জন্যই ভূতলে এই বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

মৃত্যু-রহস্য।

মুখবন্ধ।

মৃত্যু নামেই রহস্য। আবার এক একটী মৃত্যু বড় রহস্যজনক। এরূপ মৃত্যু আমারই ঘটিয়াছিল। তবে আমার মৃত্যুর কথা আমি লিখি কেমন করিয়া? হাসিও না, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। শুনিলে তোমারও মরিতে ইচ্ছা হইবে। আমি এই মরিয়া একরূপ বাঁচিয়া গিয়াছি। তাই বলিয়া যাঁহারা ভূতের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। ভূত কে নয়? ভূত গঠিত দেহতেই আত্মজ্ঞান—তোমার আমার, এবং সকলেরই, তখন ভূত আমরা সকলেই। তবে ভূতের লেখা পড়িতে ভূতের আর ভয় কি? কিন্তু সে কথা যাউক। আমি ভূতও নহি, ব্রহ্মদৈত্যও নহি। তবে একবার মরিয়া ছিলাম বটে। তাই বলিয়া ভাবিও না, আমি কোন জন্মান্তরীণ কথা বলিতেছি, সে কথা বলিলে একবার কেন, কত লক্ষ লক্ষ বার মরিয়াছি তাহার সংখ্যা কে করে? আর এমন কি বা সুকৃতি করিয়াছি যে সব কথা আমার স্মরণ থাকিবে? সে কথা নহে। এই উপস্থিত দেহ ধারণ কালেই আমি একবার মরিয়াছিলাম। বেশী দিনের কথা নহে, এই সে দিন। এখন বৈশাখ মাস চলিতেছে, আর গতপূর্ব্ব বৈশাখ মাসে আমি মরিয়াছিলাম। সে অতি বিচিত্র কাহিনী। বলি, শুন।

বলিব বটে, কিন্তু ভয় হয়। ঘটনা অত্যন্ত আধুনিক। অনেকগুলি "ভদ্র" লোক ইহাতে লিপ্ত। শুদ্ধ তাঁহারা জীবিত নহেন, কেহ কেহ অদ্যাপি এই কলিকাতা সহরে বাস করিতেছেন; শুদ্ধ বাস করিতেছেন এমন নহে, এখানকার সমাজে যথেষ্ট সম্মান প্রতিষ্ঠাও ভোগ করিতেছেন। তাই ভয় হয়, দিন কাল খারাপ পড়িয়াছে, আইন কানুনও খারাপ, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে শেষে সাপ না বাহির হয়! আমার এই কাহিনী বিবৃত করিতে গেলে অনেকের স্বমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কোন কোন "পুরমহিলার"ও চরিত্র বার্ত্তা প্রচার হইবে, আমার সেটা ইচ্ছা নহে। কিন্তু অপর পক্ষে জ্ঞানের বিস্তারের নিমিত্ত, বিজ্ঞানের উন্নতির নিমিত্ত, সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত, আমার এ মৃত্যুরহস্য প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। না করিলে আমার কর্ত্তব্য হানি হয়। আমি করি কি, আচ্ছা, ঘটনাবলীর যথাতথ্যতা সংরক্ষণ করিয়া ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব সঙ্গোপন রাখিলে উভয় কুল রক্ষা হইতে পারে না? আমি তাহাই করিব। আমি ইঁহাদিগকে কাল্পনিক নামে অভিহিত করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গতপূর্ব্ব বৈশাখ মাসে আমার এই মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তখন আমি দার্জ্জিলিঙ্গে। বি, এ পরীক্ষা দিবার পর তথায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আরও একটী কারণ ছিল, তাহা কিন্তু পরে। যে বাটীতে আমি বাসা লই তাহার বাঙ্গালা নাম গোলাপবন। সব হুবহু মনে পড়িতেছে, যেন কালিকার কথা। যেরূপ কাণ্ড বোধ হয় চিরদিনই এইরূপ মনে থাকিবে। আমার সঙ্গে আমার পাচক ব্রাহ্মণ অনন্ত ঠাকুর গিয়াছিল, আর গিয়াছিল সদানামে উড়িয়া বেহারা। গোড়াতেই বলা ভাল, আমি ছেলে বেলা থেকেই মাছ মাংস খাইতাম না। হিন্দুদের অন্যান্য সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে ইদানীং আমার কিছু কিছু মত পরিবর্ত্তন ঘটিলেও আহারাদি বিষয়ে আমি অনেকটা শুদ্ধাচারী ছিলাম, স্বভাবতঃই কেমন বিধর্ম্মীর পক্কান্ন ভোজন করিতে স্পৃহা হইত না। সেই জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে বিশেষতঃ আমাকে ঘরের ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া দেখি, আমার বাসা বাটীটি যে রূপ বড়, এবং যেরূপ

নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত, তাহাতে আমি আর লোক জন না আনিয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছি। অন্ততঃ পাঁড়েজীকে সঙ্গে আনিলে অনেকটা নিরাপদ হইবার ভরসা ছিল। সে আমাদের সদর কাছারীর পাইক, পুরাতন ভৃত্য, ইদানীং দ্বারবান রূপে আমার কলিকাতার বাসাতেই থাকিত। কিন্তু তাহাকে আনিবার একবারেই যো ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবধি আজ চারি বৎসর কাল আমি কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম, বাসা আমার জিনিস পত্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সকল আগুলিবার দ্বিতীয় লোক ছিল না। মাষ্টার মহাশয় থাকিলেও কথা ছিল। তিনি আমার গার্হস্থ শিক্ষক। কলিকাতায় একক থাকিতে হইত বলিয়া তিনি কর্ত্তৃপক্ষরূপে আমার সঙ্গে একত্রে থাকিতেন।

দার্জিলিঙ্গে আসিয়া আমি বিশেষ রূপে তাঁহার অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। শিক্ষক হইলেও তিনি আমার সহিত অকপটে বন্ধুভাবে মিশিতেন, আমায় গীত বাদ্যাদি পর্য্যন্ত শিখাইতেন। থিয়েটারে না লইয়া যান, ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবারে গান শুনাইতে লইয়া যাইতেন। অধিক কি, আমার নূতন বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, দাম্পত্য বিষয়ের কথা পর্য্যন্ত কহিতে দ্বিধা করিতেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, আমাকে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। আমি দার্জ্জিলিঙ্গের মনোহারী স্বভাব শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলাম। সুন্দর স্থানে সঙ্গী না থাকিলে বড় কষ্ট, গল্প না করিতে পারিলে, যেন সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে উপভোগ করা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আনিবার উপায় ছিল না। আমার পরীক্ষার শেষে তিনি দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেশ ফরিদপুর। যাহা হউক, অধিক দিন, আমার এই নির্জ্জনতা ভোগ করিতে হইল না।

কলিকাতা হইতে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাবু মুরারিমোহন নামে একটী ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হয়। ঠনঠনিয়ার ৺কালীতলায় যে বাটীতে আমার বাসা ছিল, মাষ্টার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি তাহার এক অংশ খালি করিয়া দিই। কয়েক দিনের পর এই ভদ্রলোকটী সেই অংশ ভাড়া লইলেন। কাজে কাজেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। এক্ষণে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে তিনি সপরিবারে দার্জ্জিলিঙ্গ

বেড়াইতে আসিলেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে আমি নিজ বাসাতেই তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহাই এই আখ্যায়িকার বর্ণনীয় বিষয়। এক্ষণে কিছু পূর্ব্ব কথা বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুরারী বাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা লাবণ্য আসিয়াছিলেন।

লাবণ্যলতা অবশ্যই কাল্পনিক নাম। এই নাম মনোনীত করিবার কারণ এই, যথার্থই যেন লাবণ্য নির্ম্মিতা সেই নবীনা বল্লরী সহকার তরু বিনা একান্তই লতাইয়া পড়িতেছিল। এরূপ অলোকসামান্য রূপরাশি পূর্ব্বে কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাহার উপর ফুটনোন্মুখ যৌবনে সেই রূপ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। লাবণ্য শুদ্ধ সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি নহে, নানাবিধ সদ্‌গুণে সেই প্রতিমা বিভূষিত হইয়াছিল। কলাবিদ্যা ও সুচারু কারুকার্য্যে বালা সমধিক নিপুণা।

মুরারী বাবু আমার নিকট উপযাচক হইয়া যে আত্মবৃত্তান্ত প্রকটিত করেন, তাহা হইতে আমি জানিয়াছিলাম তিনি ময়মনসিংহের একটী বিশিষ্ট পরিবার-ভুক্ত। পরিবারটীর নাম শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম, যথার্থই ধনে মানে সেই পরিবার শুদ্ধ ময়মনসিংহ কেন—সমস্ত বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ। মুরারী বাবুর গৌর বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, সুঠাম অবয়ব, বেশভূষার পারিপাট্য, সৌজন্য ব্যবহার, সুমার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস—সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মুরারী বাবু বলেন, গৃহ-বিবাদে উত্যক্ত হইয়া তিনি পারিবারিক বসতবাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিষয় বিভাগের মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে উঠিয়াছে, যে পর্য্যন্ত না সে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হয়, ততদিন তিনি এইরূপ ভাড়াটিয়া বাটীতে একরূপে কষ্টে সৃষ্টে থাকিবার সংকল্প করিয়াছেন। মোকর্দ্দমাতেও তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন, তাহাতে প্রায় চৌদ্দলক্ষ টাকা সম্পত্তি তাঁহার অংশে পড়িবে,—ইত্যাকার কথা আমায় অতি সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে বুঝাইয়া দেন। আর তাঁহার কন্যা লাবণ্য যে তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তাহাও বলিতে ভুলেন নাই।

মুরারী বাবু ইংরেজী আদব কায়দায় খুব পারদর্শী ছিলেন। একদিন আমার

গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার পাঠের বিঘ্ন উৎপাদন করার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ আমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন মনে হয়। ব্যাপার এই, সেই রাত্রেই তাঁহাকে কার্য্যানুরোধে কানপুরে যাইতে হইয়াছিল, কত দিনে যে ফিরিতে পারিবেন কিছুই স্থিরতা ছিল না অতএব তাঁহার অনুপস্থিতি কালে আমাকে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। আমি সম্মত হইলে তাঁহাকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করা হইবে। বস্তুতঃ আমি স্বীকৃত না হইলে তাঁহার প্রভূত ক্ষতি হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ সাগ্রহ অনুরোধ না করিলেও, এরূপ উচ্চ পদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি না হইলেও, উপস্থিত বিপদে অন্য কোন ভদ্রলোকেরও অনুরোধ আমি অবজ্ঞা করিতাম না। তদুপরি মাষ্টার মহাশয়ও আমায় উপরোধ করিলেন। আমি স্বীকৃত হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি আমার সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিয়া স্বয়ং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, এবং শতমুখে আমার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে উপদেশ দিলেন।

কথামত অবশ্যই মুরারী বাবুর অনুপস্থিতিকালে আমি সাধ্যমত তাঁহাদের যত্ন করিবার ত্রুটি করি নাই। এইরূপে এই পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল।

পক্ষকাল পরে মুরারী বাবু ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু একবার সখ্য স্থাপিত হইলে ইহাঁরা সকল সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া আমার সহিত মিলামিশি করিতে লাগিলেন। এমন কি গৃহিণী ঠাকুরাণী অন্তরে থাকিলেও আমার নিকটে লাবণ্য গাহিতে বাজাইতে দ্বিধা করিত না। সে সরলা, আমার কিন্তু কেমন কেমন লজ্জা বোধ হইত। তবে গৃহিণী বহুক্ষণ আমাদের উভয়কে এরূপ অবস্থায় দেখিলে কখনও বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ করিতেন না। মুরারী বাবুর কথা না বলিলেও চলে। তিনি কার্য্যানুরোধে প্রায়ই মফঃস্বলে থাকিতেন, কদাচিৎ গৃহে আসিতেন, আসিলেও দুই তিন দিনের অধিক কখনও থাকিতেন না। ফলে, ক্রমে এই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার আমার উপরই পড়িল।

এইরূপে আরও কিছুদিন কাটিল। আমি ইহাঁদের ব্যবহারে মোহিত হইলাম। ক্রমশঃ।

শ্রীভঃ——

অলৌকিক ঘটনাবলী।

২০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সিন্দুরীয়াপটীর পূর্ব্বাংশে রামমোহন সার গলিতে একটি ত্রিতল পাকা বাটী ছিল। সেই বাটী অতিক্রম করিয়া লেখকের কোন বন্ধু একটি বাটীতে বাস করিতেন। গ্রীষ্মকালের একদিন মধ্যাহ্নে লেখকের আর দুইটি বন্ধু নিতাই ও তুলসী বাবু উভয়ে ঐ রামমোহন সাহার গলিস্থ বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহারা উভয়ে সেই ত্রিতল বাটীর নিকটে গমন করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন একটী ষোড়শী যুবতী সেই ত্রিতল বাটীর সদর দরজা অর্দ্ধউন্মুক্ত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হস্ত সঙ্কেত করিয়া ইহাঁদের উভয়কে ডাকিতেছে।

নিতাই ও তুলসী বাবু উভয়েই বলবান ও নির্ভীক যুবা ছিলেন। তাঁহারা সেই রূপসী যুবতী কর্ত্তৃক আহূত হইলে, ইহার রহস্য কি জানিবার উদ্দেশে সেই ত্রিতল বাটীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যুবতী তাঁহাদিগকে পশ্চাতে করিয়া উপরের সিঁড়ীর দিকে যাইতেছে। বাটীতে অন্য লোকজন নাই এবং সম্মুখ প্রাঙ্গনে মিহি-ধুলা জমিয়া আছে। তাঁহারা উভয়ে যুবতীর পশ্চাতে পশ্চাতে সিঁড়ী দিয়া দ্বিতলের উপর উঠিয়া দেখিতে পাইলেন যে বারেন্দায় মাদুর পাতিয়া একটি অত্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ শয়ন করিয়া আছেন। নিতাই বাবু বৃদ্ধকে অনেক ডাকাডাকি করাতে বৃদ্ধ হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক একটি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া একবার মাত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পুনরায় নিদ্রা গেলেন। এতক্ষণ ঐ যুবতীটি ত্রিতল সিঁড়ীর প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া ছিল তাঁহারা পুনরায় তাহার অনুসরণ করিয়া ত্রিতলের বারেন্দায় গমন করিয়া দেখেন একটি প্রাচীনা স্ত্রী ঠিক পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়া আছেন এবং তিনিও অনেক ডাকা ডাকির পর ঐ দ্বিতলস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ইহাঁরা আবার যুবতীটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, সে ত্রিতলের একটি সজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল দেখিয়া তাঁহারাও উভয়ে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন ঘরটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত একখানি বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচিত ও মেজেতে একটি ঢালা বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে। রূপাবাঁধান হুঁকা, কলিকা, পানের বাটা ও একটি কড়াতে অগ্নি রহিয়াছে। তাঁহারা ইহা দেখিয়া যুবতীকে বলিলেন আপনি কে, কি নিমিত্ত আমাদিগকে ডাকিলেন? আপনার বাটীতে ভৃত্যাদি কোথায় আমাদের একবার তামাকু দিতে বলুন না; কিন্তু যুবতী কোন উত্তর না করিয়া পর্য্যঙ্কের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাতে নিতাই বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, তাহাতে যুবতী খাটের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, নিতাই বাবুও উহার পশ্চাৎ ২ ঘুরিতে লাগিলেন। ক্রমশ যুবতী অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে লাগিল নিতাই বাবুও তাহাই করিলেন. কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে ধরিতে

পারিলেন না ; এই সময়ে যুবতী হটাৎ গৃহ হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া পড়ায় নিতাই বাবুও তুলসী বাবু হয়ত কোন বিপদ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে যুবতীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। দ্বিতলে নামিয়া যুবতীকে কেহই আর দেখিতে পাইলেন না। এখানে বলা আবশ্যক যে, নামিবার সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধাস্ত্রী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন সত্বর তাঁহারা অবতরণ করিয়া একেবারে উঠানের উপর দিয়া যেমন সদর দরজার দিকে যাইবেন দেখিলেন যে ত্রিতলের বারেন্দা হইতে সেই যুবতী অগ্নি পাত্রটি ফেলিয়া দিয়া বিকট হাস্য করিতে লাগিল, অগ্নি পাত্র প্রাঙ্গনে পড়িবা মাত্র উহা হইতে তুবড়ির ন্যায় অগ্নিশিখা তৃতল পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল ভাগ্যক্রমে অগ্নি তাঁহাদের গাত্রে লাগে নাই, তখন তাঁহারা অতি সত্বর সদর দরজার দিকে দ্রুতপদে চলিলেন, তথায় দেখিলেন যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ যিনি দ্বিতলে মাদুরের উপর নিদ্রিত ছিলেন তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই বাবু বৃদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু প্রাচীন কোন উত্তর না দিয়া আস্তে আস্তে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুর বাটীতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলেন। শুনিয়া তিনি কহিলেন তোমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে জীবিত ফিরিতে পারিলে কারণ ঐ বাটীতে যাহাদে' দেখিলে তাহারা কেহই জীবিত মনুষ্য নহে। এককালে তাহারা পিতা মাতা ও কন্যা তিনজনেই জীবিত ছিল বটে, কিন্তু ২।৩ দিনের মধ্যে কলেরা রোগে তাহাদের তিনজনেরই মৃত্যু হয়, সেই অবধি তাহারা ঐ বাটী আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ও অসাবধান লোককে ভুলাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গি বিভীষিকা দেখাইয়া প্রাণ নষ্ট করে। তোমাদের কপাল বড়ই জোর তা বাঁচিয়া পলাইতে পারিয়াছ। কয়েক বৎসর হইল সে ত্রিতল বাটী ভাঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু এই ঘটনার উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় অদ্যাপি জীবিত আছেন।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

একটি সঙ্গীত।

কাফি—মধ্যমান।

ত্রয়গুণাতীত হও শিবানী শ্যামা।
তূর্য্য ভাব অনির্ব্বাচ্য সে ভাব অতীত গোমা॥
জগদণ্ড কি পিণ্ডাণ্ড, স্থূলসূক্ষ্ম কাণ্ডাকাণ্ড।
তুমি তারা ত্র ব্রহ্মাণ্ড সুপ্তিতে স্বপন সমা॥
দ্যুলোকে নির্ম্মলা শক্তি, ভূলোকে সমলা অতি।
মুক্তভক্তে মুক্তিভক্তি আদ্যাশক্তি নিরুপমা॥
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদে, ফোর্স ম্যাটার নামভেদে।
ডাকিতেছে উচ্চ নাদে মূল-তত্ত্ব বোঝেনা মা॥

শ্রীশ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১ম ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪। [২য় সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

মাসিক পত্র।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়।
৩১।১নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট বিভাবতী প্রেসে
অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ একটাকা, মফস্বলে ১৶৹ আঠার আনা।
প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

নিয়মাবলী।

কলিকাতার "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶৹ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄১৹ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। প্রতি মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে "পন্থা" প্রকাশিত হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ আমাদিগকে জানাইবেন, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

৪। টাকা-কড়ি ও পত্রাদি এবং প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি নিম্ন ঠিকানার আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄৹ আনা কমিশন লাগিবে।

৫। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৬। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। গ্রাহক হইবার জন্য যাঁহারা মনি-অর্ডার পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৭। "পন্থার" বিজ্ঞাপন দিবার সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়
৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে, পত্র লিখিলে অথবা আমা[র] সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত বন্দবস্ত হইয়া থাকে।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক,
কার্য্যাধ্যক্ষ বিজ্ঞাপন বিভাগ

জন্মান্তর রহস্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নূতন
মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

The book before us deals with the subject of re-births. The book is published as the first instalment of a series of theosophical publication in Bengali which Babu Aghor Nath Datta undertakes to bring out, in order to eradicate the erroneous belief that the cultivation of "Theosophy" has the effect of undermining one's faith in Hinduism. The subject chosen, as the first instalment of the serial, is a happy one, * * how the theory of re-incarnation, maintained by theosophists, receives its support from the Hindu Shastras, and how the Shastras are broad-based on science and universal truth.

INDIAN MIRROR

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, ৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১ম ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪। [২য় সংখ্যা।

একটি অদ্ভুত স্বপ্ন।

১৭ জানুয়ারী, ১৮৮৭।

সেবক শ্রী——

বড় এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি; আমার বোধ হয় ঐ স্বপ্নের ভিতর কোন গভীর অর্থ আছে সেই জন্য উহার বিবরণ আপনাকে লিখিতেছি উহার ভিতর যদি কিছু অর্থ থাকে তবে আমাকে লিখিবেন। স্বপ্নটি এই——

আমি ছোটদাদা ও আমার আরও দুইজন বন্ধু দেশ পর্য্যটনে যাইবার পরামর্শ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে বেড়াইতেছি এমন সময় ছোটদাদা বলিলেন যে বাড়ী থেকে একটি ব্যাগ লইয়া আইস। তাঁহার কথামত বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং ব্যাগটি লইয়া চাকরের মাথায় দিয়া আবার ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। খানিকদূর যাইয়া মনে হইল যে দেশভ্রমণে যাইব কি না এবং এই বিষয়ই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছি এমন সময় দেখি একটি সুন্দরী

বালিকা আমার সামনে আসিয়া আমার গতিরোধ করিল। বালিকাটির বয়স বৎসর ১২ কি ১৩; উহার পরিধেয় বসন অত্যন্ত মলিন, ঐ বসন কিন্তু মধ্যে মধ্যে পুড়িয়া গিয়াছে এবং সেই সেই স্থান হইতে বালিকার সৌন্দর্য্যের আভা বাহির হইতেছে। আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা আমার গমনে বাধা দিতেছ। বালিকা উত্তর দিল "আমার নাম চিত্ত আমি চঞ্চল হইয়াছি" এই বলিয়া তাহার ছোট হাত খানি আমার মুখের কাছে কেবল নাড়া দিতে লাগিল। আমি তাহার উত্তরের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং তাহার দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে "তুমি কাহাদের চিত্ত এবং কেনই বা এখানে আসিয়াছ।" সে উত্তর করিল "আমি চিত্ত আমি তোমারই চিত্ত," আমি তোমার সহিত এখানে আসিয়াছি, তুমি যেখানে থাক আমিও সেইখানে থাকি"।

প্রশ্ন—তুমি কেনই বা এত মলিন বসন পরিয়া আছ এবং ঐ বসন মাঝে মাঝে কিরূপেই বা পুড়িয়া গিয়াছে?

উত্তর—তোমার চিত্তকে তুমিই ঐরূপ মলিন আবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়াছ; মধ্যে মধ্যে যেখানে ধর্ম্মবহ্নি লাগিয়াছে সেইখানে পুড়িয়া গিয়াছে; যদি আমার প্রকৃত রূপ দেখিতে চাও তবে আমার সমস্ত কাপড় খানি ঐ রকমে পুড়াইয়া দিয়া আমাকে উলঙ্গ কর; আমাকে আর আবরণে রাখিও না"।

প্রশ্ন—তুমি কি একা না তোমার আর কেহ আছে; যদি কেহ থাকে তবে তাহারা তোমাকে কেনই বা ছাড়িয়া দিল আর কেনই বা তুমি এত চঞ্চল হইলে?

উত্তর—আর কেহ থাকিবেনা কেন; এই সংসারে যত জীব আছে, আমার ভাই ভগিনীরা সকলে এক এক জন, তাহাদের এক এক জনের চিত্ত; যত পুরুষ জাতীয় জীব তাহাদের চিত্ত আমার ভগিনিগণ এবং যত স্ত্রীজাতীয় জীব আছে তাহাদের চিত্ত আমার ভ্রাতাগণ। তাহারা সকলেই আমার ন্যায় সুন্দর ও সুন্দরী এবং প্রায় সকলেরই পরিধান আমার ন্যায় মলিন বসন, কেবল দুই চারি জন মাত্র উলঙ্গ অবস্থায় আছে। আমার চাঞ্চল্যের কারণ এই যে

দেশভ্রমণে যাইবে কি না এই চিন্তা তোমার প্রবল হওয়াতেই আমি চঞ্চল হইয়াছি ; যে সময় ভাবিতেছ যাইবেনা সেই সময় আমি তোমার যাইবার পথে বাধা দিতেছি এবং যখন ভাবিতেছ যাইবে তখন আমিই অগ্রসর হইতেছি"।

চিত্তের এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বলিলাম যে "তুমি আর আমাকে বাধা দিও না, আমি যাইবই স্থির করিলাম"। বালিকা কিন্তু আমার কথাতে কোন কথা কহিল না এবং সামনে হইতে সরিয়াও গেল না। আমার তখন বড় রাগ হইল এবং আমার ছড়ি গাছটি লইয়া তাহাকে মারিতে গেলাম কিন্তু আমি রাগিতে না রাগিতে দেখি যে বালিকা আমার নিকট থেকে অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে সুতরাং তাহাকে আর মারিতে পারিলাম না। সেই সময় আমার ভাবনা হইল, হায় জগদীশ্বর ! একটি বালিকা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল" ! যখন এইরূপ ভাবিতেছি তখন দেখি যে বালিকা ক্রমে ক্রমে আমার নিকটে আসিল এবং অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে আমার শরীরে মিশিয়া গেল। তাহাকে আর দেখিতে না পাওয়ায় আমার মনে হইল এইবার বুঝি সকল বাধা অতিক্রম করিলাম এবং এই মনে করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়াই আবার সেই বালিকাকে সম্মুখে দেখিলাম তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গমনে বাধা দিবার জন্য আবার যে তুমি উপস্থিত হইলে ইহার কারণ কি ? আমি যখন তোমাকে মারিতে গেলাম তখন দূরে চলিয়া গেলে এবং যখন ভগবানের নাম লইলাম তখন নিকটে আসিয়া আমার সহিত মিশিয়া গেলে এ সকলের অর্থ কি ? বালিকা বলিল "যখন আমাকে মারিতে গেলে তখন তোমার ভিতর ক্রোধের উদয় হইয়াছিল কিন্তু ক্রোধাদি রিপুগণই চিত্ত চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ, তাহাই তোমার চিত্ত আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া দূরে যাইলাম কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকিলে তখন চিত্ত সংযত হইল এবং আমি তোমাতে লয় পাইলাম। যদি আমার চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে চাও তবে সংযম অভ্যাস কর তাহা হইলেই আমি সংযত হইয়া তোমাতে লয় পাইব। একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিয়া আমার লয় সাধন করিতে যতদিন না পারিবে ততদিন আমি এইরূপ চঞ্চল থাকিব এবং তোমার সকল কর্ম্মে বাধা দিব"। চিত্তের এই কথা শুনিয়া আমি একমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম এবং ভ্রমণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেই অবধি বালিকা আর আমার পথে বাধা দিতে আসিল না।

উপরিলিখিত পত্র খানি হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি সেই জন্য উহা আজ পাঠকগণকে উপহার দিলাম। যে দুই চারি জন মনুষ্য তাঁহাদের চিত্তের আবরণ জ্বালাইয়া দিয়াছেন তাঁহারাই মহাপুরুষ। চিত্তের আবরণ জ্বালাইবার কৌশল কেবল তাঁহারাই জানেন। সেই কৌশলের নাম যোগ। যদি কেহ সেই কৌশল শিখিবার জন্য আগ্রহ হইয়া থাকেন তবে

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"।

গীতা।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মশিক্ষা।

সদ্যজাত শিশুর দেহটি নূতন, কিন্তু মনটি নূতন নহে। দেহটি পিমাতার শুক্র শোণিত হইতে নয় মাস দশদিন কালমাত্র উৎপন্ন ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চবায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে মন কত দিন উৎপন্ন হইয়াছে, কিরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে মনের জন্ম হইয়াছে; যখন মন জন্মিয়াছে তখন শরীর জন্মে নাই। মন এক এক বার একটি করিয়া শরীর ধারণ করেন আর সেই শরীরের সহায়তায় নিজের বিকাশ সাধন করিয়া নানাবিধ সংস্কার সংগ্রহ করেন। শরীরটি জীর্ণ হইলে তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যান—পুনরায় নূতন শরীর ধারণ করেন। এই রূপে মন লক্ষ লক্ষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন। বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ লইয়া যায়, মন তেমনি এক এক জন্মের কর্ম্মের সংস্কারগুলি সঙ্ক্রম করেন। এই সমস্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন এবং পুনর্জ্জন্মে তিনি স্বভাবতঃ যাহা কিছু ভাবেন, যাহা কিছু করেন, সে

সকলই পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ফল। এইরূপে কেহ জন্মাবধি সৎ, কেহ অসৎ; কেহ সরল, কেহ ক্রূর; কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ; কেহ বিষয় বিশেষে নিপুণ, কেহ বিষয় বিশেষে নিস্পৃহ, ইত্যাদি হয়।

এক একটি জন্ম এক একটি শিক্ষাক্ষেত্র। পূর্ব্ব জন্মে মনের যে বৃত্তির যত টুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল পর জন্মে তাহার আরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। পূর্ব্ব জন্মে যে বৃত্তিটির উন্নতি সাধন করা হয় নাই বরং অবনতি করা হইয়াছে, বর্ত্তমান জন্মে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহাকে উন্নত করিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মে মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলিতে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকিলে বর্ত্তমান জন্মে তাহাদিগকে আয়ত্তাধীনে আনিতে শিক্ষা করিতে হয়। এই সমস্ত না করিলে বর্ত্তমান জন্মটা এককালীন বৃথা যায়। কেন যায়? জন্ম, কর্ম্ম, যত কিছু বল, সকলেরই উদ্দেশ্য, মনকে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ করিয়া সেই মুকুরে আত্মদর্শন। মনকে নির্ম্মল করিতে হইলে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে ঘষিয়া মাজিয়া চক্ চকে করিতে হয়। এই ঘষা মাজার নাম শিক্ষা।

বর্ত্তমান কালে শিক্ষা এক পেশে হইয়া পড়িয়াছে। মনের তিন শ্রেণীর বৃত্তি আছে; মানসিক বৃত্তি (intellectual faculties), হৃদয় বৃত্তি (feelings) এবং ধর্ম্মবৃত্তি (religious and moral faculties) বর্ত্তমান কালে মনের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা না হইয়া কেবল মানসিক বৃত্তিগুলির শিক্ষা বিধান হইয়া থাকে; হৃদয় বৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তিগুলি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের বশাধীন হইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করে; তাই একালে মনুষ্য প্রকৃতির সামঞ্জস্য নাই, সমতানতা (harmony) নাই। তাই বিদ্যা অর্থকরী হইয়া দঁড়াইয়াছে; তাই ধর্ম্মের নদীতে স্রোত নাই; অধর্ম্মের নদী, ভাদ্র মাসের পদ্মা।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিরা ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তির শিক্ষাবিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন ধর্ম্মশিক্ষা সকল শিক্ষার কেন্দ্র। অপর যে শিক্ষার জ্যোতিঃ এই কেন্দ্রে না পড়িত সে শিক্ষাকে তাঁহারা শিক্ষা বলিতেন না। তাঁহারা মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে আনয়ন করিবার জন্য সুকুমারমতি বালক বালিকার উপনয়ন দিতেন। উপনয়ন, জীবনের প্রধান সংস্কার—মন—পূর্ণ-মনকে নির্ম্মল করিবার জন্য, পূর্ব্বজন্মের বিরুদ্ধ ভাবগুলি দমন করিয়া সাধুভাব দ্বারা মনের উন্নতির জন্য এই সংস্কার; ইহা প্রকৃতই মনের দ্বিতীয়

জন্ম। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঋষিরা এই জন্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা ইহার আনুসঙ্গিক ছিল।

গৃহসূত্র, মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতি পড়িলে বেশ বুঝা যায়, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ঋষিরা কিরূপ সুন্দর নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম শিক্ষার এরূপ প্রণালী ও পদ্ধতি কোন দেশের কোন শাস্ত্রে নাই—প্রত্যুতঃ ধর্ম্মশিক্ষা বলিয়া যে একটা শিক্ষা আছে তাহাও অন্যান্য দেশের লোকেরা জানেন না।

আমাদিগের চিরদিনের এই গৌরবের ধন ধর্ম্মশিক্ষা হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতে গিয়াছি। যাহাতে পুনরায় এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। আজ কাল ধর্ম্মশিক্ষার দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং সেই উদ্দেশে কোন কোন স্কুলে বেদ স্মৃতি প্রভৃতি পড়ান হইতেছে ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে ধর্ম্মশিক্ষার পদ্ধতি ওরূপ নহে। পুস্তক পাঠে ও বক্তৃতা শ্রবণে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং" ইত্যাদি ছে[illegible] বেলার অভ্যস্ত শ্লোকটি মনে করিয়া দেখিবেন। কাজের দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা করি[illegible] হয়—শাস্ত্রে যে পথ দেখাইয়াছে সেই পথ ধরিয়া চলিতে হয়, তবেই বেদ[illegible] পড়ার ফল, নতুবা কেবল ভেড়ার শৃঙ্গে হীরা ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। গু[illegible] শিষ্য উভয়ে শাস্ত্র প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জীবন ব্যবস্থাপিত ক[illegible] তবে বেদাদি পড়ুন ত ফল পাইবেন; নতুবা, বেদ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে মস্তিষ্কগত জ্ঞানে পরিণত করিতে গিয়া ফল হয় কেবল খিচুড়ি পাকান।

ঋষিদিগের প্রদর্শিত জ্ঞান যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির জিনিষ হয়, তবে তাঁহারা সেই জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য যে পথ দেখাইয়াছেন তাহার উপরেও আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি হওয়া উচিত। হনুমান লাফ দিয়া সাগর পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বানরের জন্য সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল। ঋষিরা আমাদিগের জন্য সেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যদি তাহার আশ্রয় না লইয়া লাফ দিয়া সাগর পার হইতে চাই, তবে অমৃত ফল আমাদের ভাগ্যে জুটিবে না, লাভের মাধ্যে দুরাশা সমুদ্রের গভীর জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

ভক্তি-তত্ত্ব।

(প্রথম সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

"ভক্তি" এই শব্দের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার ভাব সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের, আত্মসমর্পণের ভাব নিহিত রহিয়াছে। যেখানে স্বার্থ, যেখানে অহঙ্কার, যেখানে আত্মম্ভরিতা লক্ষিত হয়, সেখানে জ্ঞান বা কর্ম্ম লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু সেখানে ভক্তিভাব লক্ষিত হইতে পারে না। ভক্তি আত্মনিহিত সেই বস্তু, যাহা মানবের স্বার্থকে ভগবদর্থে, অহঙ্কারকে দীনতায় ও আত্মম্ভরিতাকে পরার্থপরতায় বিলীন করিয়া, বিলুপ্ত করিয়া, অণুচৈতন্তকে ব্যাপকচৈতন্যে, অংশকে অংশীতে, দাসকে প্রভুতে, শক্তিকে শক্তিমানে আত্মসমর্পণ করায়। ভক্তি অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দেয়। উহা ভগবদ্‌বিমুখ মানবকে নিরন্তর স্মরণ দ্বারা সদা তৎসাম্মুখ্য প্রদান করে। ভক্তি জীবের সেই বৃত্তি, যে বৃত্তি ক্ষুদ্রতম মানবকে বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়া অংশকে অংশীর সহিত সম্মিলিত এবং প্রেমবন্ধনে বন্ধন করে। উহা মানবের অস্বাভাবিক অহঙ্কারকে স্বাভাবিক অহংভাবে বিলীন করিয়া তাঁহার অস্বাভাবিক প্রভুত্বের চিরবিস্মৃতি ঘটাইয়া স্বাভাবিক দাস্যবুদ্ধির উৎপাদন করিয়া দেয় এবং পরিশেষে তাঁহার অণীয়সী ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের মহীয়সী ইচ্ছায় মিশাইয়া দিয়া চিরবিরহিণী শক্তিকে শক্তিমানের সহিত সম্ভোগদশায় সম্পূর্ণ একীভূত করে। ভক্তি মানবের স্বতন্ত্রতাকে ঈশ্বরতন্ত্রতায় পর্য্যবসিত করিয়া দেয়। উহা জীবের নিখিল স্বার্থমূলক কর্ম্মকে পরার্থমূলক প্রেমমূলক করিয়া দিয়া জগতের বিদ্বেষভাবকে প্রীতিভাবে পর্য্যবসিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করে। ভক্তি মানবের সেই সাধন, যাহা তাঁহার অহংকে অহঙ্কারশূন্য করিয়া আত্মবিস্মৃত করিয়া পরহিতের জন্য জগতের হিতের জন্য তত্ত্বজ্ঞানালোকে সমালোকিত করে। ভক্তি সেই সাধন, যে সাধন স্বয়ং সাধ্যরূপে পরিণত হইয়া মানবকে বিশ্বপ্রেমে বিশ্বপতির প্রেমে বিমোহিত করিয়া ফেলে। ভক্তি সেই বস্তু, যাহা মানবকে নিজের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য-

রহিত করিয়া দিয়া সংসারকে ও সংসারপতিকে সতত তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে সংস্থাপিত করে। ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদিসাপেক্ষ নহে বা উহা কর্ম্ম জ্ঞান বা বৈরাগ্যও নহে; পরন্তু উহা তত্তন্নিরপেক্ষ এবং উহাদের সার, উহাদের মূল। যে কর্ম্ম জীবকে স্বার্থের দাস করিয়া অশীতিলক্ষ যোনিতে এবং লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করাইতেছে, সে কর্ম্ম কখনই ভক্তি হইতে পারে না। যে জ্ঞান সুদারুণ নির্ব্বাণদশা আনয়ন করিয়া জীবকে এক ভীষণ অনস্তিত্বে লইয়া যায়, সে জ্ঞান কখনই ভক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার যে বৈরাগ্য দুর্ব্বল জীবকে সংসারসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া তাঁহার স্বভাব-কোমল সরস হৃদয়কে বজ্র হইতেও কঠিন ও নীরস করিয়া দেয়, সেই বৈরাগ্যও কখনই ভক্তিপদের যোগ্য হইতে পারে না। ভক্ত সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াও কখনই বিশ্বের সেবা বিশ্বপতির সেবা ভুলেন না। ভক্ত আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়াও কখনই তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত হয়েন না। ভক্ত স্বার্থ সম্বন্ধে কঠিন এবং কঠোর হইয়াও বিশ্বার্থে বা বিশ্বপতির অর্থে কখনই কোমলতারহিত বা কর্কশ হয়েন না। ভক্ত বিশাল বিশ্বরাজ্যকে নিজের যথেচ্ছাচারের বা ভোগে স্থান বিবেচনা করেন না; অথবা তিনি এই স্থানে আপনাকেই সর্ব্বেসর্ব্ব দেখেন না। এই মর্ত্ত্যলোকে তিনি আপনাকে নিখিল বিশ্বসংসারের এক ক্ষুদ্র অংশ জানিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অবিরোধে দীন হইতে দীনতরভাবে কা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার ঐ কার্য্যও কেবল পরার্থপরতার নিদর্শন মাত্র। ভক্ত আপনাকে মহান্ পরমেশ্বর ভাবেন না; পরন্তু তিনি আপনাকে এবং আপনার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শত শত জীবের নিবাসভূত এই বিশাল বিশ্ব-সংসারকে এক মহান্ পরব্রহ্ম পরমাত্মার অধীনে পরিচালিত ও তদাশ্রয়ে সংস্থিত তদীয় মূর্ত্তিরূপেই শক্তিরূপেই শক্তিপ্রকাশের স্থানরূপেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্ত এই জগৎকে স্বমায়ারচিত ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন না, পরন্তু তিনি ইহাকে সত্য পরমেশ্বরের সত্যকল্পনা বিবেচনা করিয়া পরম প্রীতি সহকারে ইহার সেবায় আস্থাবান হইয়া থাকেন। ভক্তের বিশ্বপ্রীতি অভক্তের ন্যায় ভোগ্যদৃষ্টিতে নহে, পরন্তু সেব্যদৃষ্টিতেই হইয়া থাকে। তাঁহার জ্ঞানবৈরাগ্যাদিও ভোগের জন্য লাভের জন্য নহে, পরন্তু সেবার জন্য। অত-এব ভক্ত হিংসাদিবিরহিত ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া মায়াবন্ধন—সংসার-

বন্ধন হইতে মুক্ত ও স্বস্বরূপে রমমাণ হয়েন। ভক্তের ভক্তি তাঁহার আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। অতএব ভক্তিকে মানবের পরমপুরুষার্থসিদ্ধির অমূল মূল বলা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতিসম্ভব গুণ অব্যয় অর্থাৎ নির্বিকার দেহীকে বন্ধন করিয়া থাকে। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণটি নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক (জ্ঞানব্যঞ্জক) ও অনাময় (দুঃখ-বিরোধি-সুখ-ব্যঞ্জক)। হে অনঘ! উহাই জীবকে সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা কারণশরীরে বন্ধন করে। রজোগুণটিকে রাগাত্মক (অভিলাষাত্মক) জানিবে। ঐ রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা (বিষয়াভিলাষ) ও সঙ্গ (সংযোগাভিলাষ) জন্মে। হে কৌন্তেয়! উহাই জীবকে কর্ম্মসঙ্গ (কর্ম্মাভিলাষ) দ্বারা সূক্ষ্মশরীরে বন্ধন করে। তমোগুণকে অজ্ঞানব্যঞ্জক জানিবে। উহা সকল জীবের মোহন (বিপর্য্যয়জ্ঞানজনক)। হে ভারত! উহাই প্রমাদ (অনবধানতা, সত্ত্বকার্য্য-প্রকাশবিরোধিনী অকার্য্যপ্রবৃত্তি) আলস্য (অনুদ্যম, রজঃকার্য্য-প্রবৃত্তিবিরোধিনী [illegible]র্য্যাপ্রবৃত্তি) নিদ্রা (অবসাদ, সত্ত্বরজঃকার্য্যবিরোধিনী কার্য্যাকার্য্যনিবৃত্তি) [illegible]রা জীবকে স্থূলশরীরে বন্ধন করে। যিনি আমাকে অব্যভিচারী (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকবিশিষ্ট ব্রহ্মভাব—শুদ্ধ বা তুরীয় জীবভাব প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মাংশভূত বা ব্রহ্মশক্তিভূত জীব নিজের ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।"

এই স্থলে শ্রীভগবান ভক্তিকেই জীবের মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সেবারূপ কর্ম্ম এবং সেব্যতত্ত্বানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানও ব্যর্থ হইল না; কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম এবং তাদৃশ জ্ঞানও ভক্তির অঙ্গীভূত, ভক্তি হইতে অতিরিক্ত নহে। উক্ত কর্ম্মের এবং উক্ত জ্ঞানের ভক্তিতে উপযোগিতাই শ্রবণ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একচত্বারিংশৎ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মা অর্থাৎ যিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং জ্ঞানসংছিন্নসংশয় অর্থাৎ যিনি মদুপদিষ্ট জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয়ের উচ্ছেদ করিয়াছেন, সেই আত্মদর্শীর কর্ম্ম সকল অর্থাৎ সেবারূপ কর্ম্মসকল আর তাঁহাকে বন্ধন করে না।"

জীবের ঐ কর্ম্মবন্ধন বা সংসার মিথ্যাও নহে, পরন্তু অসার। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে কার্য্যসত্তা দ্বারা কারণসত্তা বোধ করাইয়া বেদ স্বয়ংই সংসারের সত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সত্যসঙ্কল্প, তৎকৃত সৃষ্টি কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। তবে যে কোথাও কোথাও সংসারের মিথ্যাত্বোক্তি দৃষ্ট হয়, সে কেবল উহার অসারত্ব প্রদর্শন দ্বারা জীবের বৈরাগ্যোৎপাদনার্থই জানিতে হইবে। অতএব তাদৃশ সংসার হইতে মোচন-রূপ পুরুষার্থের হেতু যে ভক্তি তাহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইলেই মায়া তাঁহাকে আবরণ করেন। মায়ার আবরণে তাঁহার ঈশ্বরবিস্মৃতি ঘটে। ঈশ্বর স্মৃতিবহির্ভূত হইলেই জীবের স্বরূপস্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়। স্বরূপের স্ফুরণ রহিত হইলে, বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মভ্রম হইয়া থাকে। দেহাত্মবুদ্ধিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ অর্থাৎ এই জগৎ আমা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু এই প্রকার জ্ঞানবশতঃ উহা হইতে নানাকারণেই ভয় জন্মে। ঐ ভয়ের শেষ ভয়ই মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ের বারণ শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে হয় না। মৃত্যুভয় হইতে নিষ্কৃতি-লাভের নিমিত্ত যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, তদ্দ্বারা মৃত্যুভয়ের আত্যন্তিক বারণ হয় না। জ্ঞানের অনুশীলনেও মৃত্যুভয়ের নিবারণ হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-লভ্য লোক সকল মৃত্যুগ্রস্ত। অতএব মৃত্যুভয়ের নিবারণার্থ দুরত্যয় ভগবন্মায়ার অতিক্রমণার্থ গুরুতে দৈবত-বুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ অনুসারে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনাকারীর ভগবৎ-সংসার-সম্বন্ধ প্রযুক্ত লৌকিক-সংসার-বীজ নষ্ট হইয়া যায়। উপাসনা শব্দের অর্থ ভক্তি। উহা কর্ম্মকে বা জ্ঞানকে বুঝায় না। কারণ সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কর্ম্ম এবং জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর। যদিও কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং বৈরাগ্যের হেতুভূত অদ্বয়জ্ঞান আপাততঃ উৎকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ঐ কর্ম্ম এবং ঐ জ্ঞান উৎকৃষ্ট নহে, অতএব উহারা উপাসনাপদবাচ্যও হইতে পারে না। উপাসনা তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত।

যাহা দ্বারা পরমেশ্বরের সমীপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম উপাসনা।

নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্ম বা চিন্মাত্রসত্তাত্মক অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসারবিদ্বেষরূপ বৈমুখ্যই বিনষ্ট হয় না, অতএব তাদৃশ কর্ম্ম বা জ্ঞান কিরূপে উপাসনাপদবাচ্য হইবে? ভগবৎসাম্মুখ্যসাধক কর্ম্ম ও জ্ঞানকেই উপাসনা বলা যায়। যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইল না, যে কর্ম্ম শ্রীভগবৎ-প্রীত্যর্থ শ্রীভগবানে অর্পিত হইল না, তাহা কি কখন তাঁহার সাম্মুখ্য বিধান করিতে পারে? আবার সংসারবিদ্বেষই যে জ্ঞানের অস্থিমজ্জা, যে জ্ঞানে কেবল অস্তিত্ব ভিন্ন শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তির বা সেব্যত্ববুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইল না, সেই জ্ঞান কি কখন সাম্মুখ্যের সাধক হইতে পারে?—কখনই না। যাহা সাম্মুখ্যের সাধক হইল না, তাহা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা যে উপাসনা হইতে নিকৃষ্ট, বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই নিমিত্তই ভক্তিশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"উপাধিরহিত অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবিবর্জ্জিত হইলে, সম্যক্ শোভা পায় না; সুতরাং সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্য কর্ম্ম বা অকাম্য কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পিত না হইয়া কিরূপে শোভা পাইতে পারে!—অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীব সংসারে জড়িত হয়েন, যে জ্ঞান সেই উপাধির নিবর্ত্তক বলিয়া নিরঞ্জন, এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত আকারগত কোন ভেদ নাই বলিয়া যাহা ব্রহ্মভাবস্বরূপ, অতএব যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান বলা যায়, তাহাও শ্রীভগবদ্ভক্তিবিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না, অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার সাধন করিতে পারে না। জ্ঞানই যখন আত্মসাক্ষাৎকার সাধন করিতে পারিল না, তখন যাহার প্রবৃত্তি কোন কারণকে লক্ষ্য করিয়া নহে, তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মও যদি পরমেশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে, তাহাও যে সম্যক্ শোভা পাইবে না, আত্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিতে পারিবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্য কর্ম্মের ত কথাই নাই।" সকাম স্বনিষ্ঠ অধিকারী সকল ভুক্তিমুক্তিলাভের নিমিত্ত এবং পরিনিষ্ঠিত অধিকারী সকল লোক-সংগ্রহার্থ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম শ্রীভগবদর্পিতভাবে আচরণ করিলেও তাহাই যথেষ্ট নহে। তাদৃশ অধিকারী সকল নিরপেক্ষ নহেন বলিয়া তদ্দ্বারাও ক্রিয়াশুদ্ধি এবং কিঞ্চিৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ভিন্ন প্রকৃত হরিতোষণ সমাহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ শরণাপত্তির অভাবে প্রকৃত আশয়শুদ্ধি ঘটে না এবং আশয়শুদ্ধির

অভাবে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগেই অধিকারী হওয়া যায় না। সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ হইয়া কেবল শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করাই শরণাপত্তি। এই শরণাপত্তি ভক্তিরই প্রথম অবস্থা এবং উহা হইতে অনতিরিক্ত, শুদ্ধা ভক্তি। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ জন্য সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি পাপের নিমিত্ত শোক করিও না।"—এবং একাদশ স্কন্ধের "আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বধর্ম্মাচরণের গুণ এবং তত্ত্যাগের দোষ জানিয়া, যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।"—এই দুইটি উক্তির একবাক্যতা করিলে, শরণাপত্তি ও ভক্তির একতাই সিদ্ধ হয়। এই শরণাপত্তিরূপ শুদ্ধা ভক্তি কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কি বৈরাগ্য কাহারই অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু জ্ঞানাদি শরণাপত্তিকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কারণ, শরণাপত্তিশূন্য জ্ঞানাদি অতীব বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া পুরুষার্থের অসাধক হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। শরণাপত্তিতে সকল বিঘ্নই উপশান্ত হইয়া যায়। ঐ শরণাপত্তি আবার কোথাও শাস্ত্রের শাসন হইতে এবং কোথাও বা আপনা হইতেই উত্থিত হইতে দেখা যায়। যেরূপেই হউক শরণাপত্তি ভিন্ন অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। সকাম স্বনিষ্ঠ ভক্তের কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে এবং পরিনিষ্ঠিত ভক্তের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতেও পূর্ণ শরণাপত্তি দৃষ্ট না হইলেও উহার কিঞ্চিৎ আভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র ভক্তিই জিজ্ঞাস্য হইতেছে। এই নিমিত্তই বলিতেছেন।——

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পৌরাণিক কথা।

কালনির্ণয়।

এক কল্পের ইতিহাসকে "পুরাণ" বলে।

ব্রহ্মার এক দিনের নাম "কল্প"।

এক কল্পে এক সহস্র মহাযুগ এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তর থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে এক মহাযুগ হয়।

আমাদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন হয়।

দেবতাদিগের এক বৎসর আমাদিগের ৩৬০ বৎসর হয়।

প্রতিযুগে "সন্ধ্যা" ও "সন্ধ্যাংশ" থাকে।

যুগ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালকে "সন্ধ্যা" বলে। দুই যুগের সন্ধিকেই "সন্ধ্যা" বলে। দিবসের যেরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, যুগের সেইরূপ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। শেষ অংশকে "সন্ধ্যাংশ" বলে। যুগ অনুসারে ধর্ম্মপরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সন্ধিকালে কোনরূপ ধর্ম্মের বিধান নাই।

ধর্ম্ম কালগত। যেমন প্রাতঃকালে মনুষ্যের স্বতঃ মধুরভাব, মধ্যাহ্নে উগ্রভাব এবং দিবাবসানে অলস ভাব হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে, প্রতি মন্বন্তরে, এবং প্রতি যুগে, কাল অনুযায়ী ভাবের পার্থক্য হয়। দিবসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। এইজন্য দিবসের ভাব পরিবর্ত্তন আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, সেরূপ দীর্ঘব্যাপী কালের পারি না।

দেবমানে যুগের পরিমাণ নীচে দেওয়া গেল। ৩৬০ দিয়া গুণ করিলেই মনুষ্যমানের সংবৎসর পাওয়া যাইবে।

	সন্ধ্যা	যুগকাল	সন্ধ্যাংশ	সমষ্টি
সত্যযুগ	৪০০	৪০০০	৪০০	৪৮০০
ত্রেতাযুগ	৩০০	৩০০০	৩০০	৩৬০০
দ্বাপরযুগ	২০০	২০০০	২০০	২৪০০
কলিযুগ	১০০	১০০০	১০০	১২০০
				১২০০০

এক কল্পে এক সহস্র মহাযুগ। এই জন্য এক কল্পে

১২০০০ X ১০০০

= ১২০০০০০০ দেব বৎসর

= ১২০০০০০০ X ৩৬০ = ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর।

এক কল্পে ১৪ মন্বন্তর। এই জন্য এক মন্বন্তরের পরিমাণ কাল

$\frac{১২০০০০০০}{১৪}$ = ৮৫৭১৪২ $\frac{৬}{৭}$ দেব বৎসর।

এক মন্বন্তরে $\frac{১০০০}{১৪}$ অর্থাৎ ৭১ $\frac{৩}{৭}$ মহাযুগ।

"স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেক সপ্ততিম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩-১১-২৪।

অর্থাৎ এক মন্বন্তরে ৭১ সত্য, ৭১ ত্রেতা, ৭১ দ্বাপর এবং ৭১ কলি যুগ। ভগ্নাংসের জন্য "সাধিকা" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, আমাদের বর্ত্তমান কাল কি।

ব্রহ্মার জীবন ১০০ বৎসর। অর্থাৎ আমাদের সপ্তলোকাত্মক বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মার কাল পরিমাণে ১০০ বৎসর স্থায়ী।

ব্রহ্মার কাল পরিমাণ কি?

আমাদের পৃথিবী এক কল্পমান স্থায়ী। এই পৃথিবীর লোক মরিয়া কি কাল অন্তরীক্ষ লোকে বাস করে। তাহার পর স্বর্গলোকে সুকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আবার "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি", পুণ্যক্ষয় হইলেই এই মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনঃ প্রবেশ করে। এই জন্য পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ও স্বর্গ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক পরস্পর সম্বদ্ধ। এই তিন লোকের সমাহার ত্রিলোকী। প্রতি কল্পে এই ত্রিলোকীর নাশ হয়। ইহাকে দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক অথবা কাল্পিক প্রলয় বলে। প্রলয়ের বিচারে ইহা দেখা যাইবে।

বর্ত্তমান কল্পে আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই কল্পের শেষে এই পৃথিবীর নাশ হইবে। এক কল্প ব্রহ্মার একদিন। আবার এই কল্প পরিমাণ কাল ব্রহ্মার রাত্রি। এইরূপ ৩৬০ দিবা রাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রহ্মার কাল পরিমাণ।

এই কাল পরিমাণকে মনুষ্যমানে "দ্বিপরার্দ্ধ" কাল বলে। এই জন্যই

আমরা বাল্যকালে "একক", "দশক", "শতক", হইতে "পরার্দ্ধ" পর্য্যন্ত গণনা করিতে শিক্ষা করি। ব্রহ্মার জীবনে এক পরার্দ্ধ" কাল অতীত হইয়াছে। আমাদের এই কল্প দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদি কল্প।

এই কল্পের নাম "বরাহ" কল্প।

বরাহ কল্পের ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে।

এখন সপ্তম মনুর অধিকার কাল।

সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত।

এইজন্য এই মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর।

বৈবস্বত মন্বন্তরে ২৮ সত্যযুগ, ২৮ ত্রেতাযুগ, ২৮ দ্বাপর যুগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন অষ্টাবিংশতি কলিযুগ বর্ত্তমান।

কলিযুগের পরিমাণ ১২০০ দেব বৎসর অর্থাৎ

১২০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০ মানব বৎসর।

১৩০৪ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা হাতে করিয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে—

"অথ শ্বেত বরাহ কল্পাব্দাঃ ৪৩২০০০০০০০। তৎকল্পাতীতাব্দাঃ ১৯৭২৯৪৯৯৯৮। তৎকল্পস্য ভূসৃষ্টিতোহতীতাব্দাঃ ১৯৫৫৮৮৪৯৯৮। কল্যব্দাঃ ৫৯৯৯৮০০। কলের্গতাব্দাঃ ৪৯৯৮।"

পঞ্জিকা দেখিয়া জানিলাম আমাদের কলির ৪৯৯৮ বৎসর অতীত হইয়াছে।

যিনি সমগ্র দৃষ্টিতে কার্য্য করেন, তিনিই পণ্ডিত। ঋষিদিগের দৃষ্টিতে এই রূপ কালের গতি জানা যায়। এই কালগতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দুমাত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

আত্মজ্ঞান।

জাগহ অমর আত্মা! করহ উত্থান—
অতিক্রমি মর্ত্ত্যভূমি গগন ভেদিয়া,
খেচরগতিতে দ্রুত করহ প্রয়াণ ;—
যেন না আসিতে হয় তোমায় ফিরিয়া।

জ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞান-রত্ন করহ সন্ধান—
অবিনাশী, অপ্রমেয়, বিমুক্ত যে ধন ;
করিলে সুদীর্ঘ কাল তার অন্বেষণ,
হ'বে লাভ অবশেষে গূঢ় সত্য-জ্ঞান।

সে রত্নে উদ্ধার হয় অতি নীচ জন,
অধম দরিদ্র যদি—হয় ধনবান ;
লভিবে নিশ্চয় তুমি সেই লক্ষ্য-স্থান,
যদি এই 'তিন' ধরি করহ প্রয়াণ।—

"সুচিন্তা, সুবাক্য, আর সুকর্ম্ম"—এ 'তিন'
হয় পূত মহাতত্ত্ব-আদেশ মহান্,
ভাবী-সত্য-সমাচার যে বীজে সংস্থান—
পুরাকাল হ'তে করে সুফল প্রদান।

শান্তিপ্রদ বাক্য-বলে জীবনে সতত,
আলোক-মণ্ডল দীপ্ত করহ সৃজিত ;—
আপন গন্তব্য-পথে ত্যজি বাদ যত,
নভ-পটে কর্ম্ম-ভাতিকর প্রকাশিত।

ব্যক্ত এই সত্য-বাণী করহ আশ্রয়,
এই দিব্য গুণচয় করহ গ্রহণ,

কর লাভ লক্ষ্য-স্থল ; যা'হতে নিশ্চয়
　　হবে দীপ্যমান তব 'স্বরূপ' আপন।

কভু কি আশীষ হেন করেছ কামনা ?
　　প্রর্থনা কি করিয়াছ ঈশ্বর সকাশে ?
জেনেছ কি আপনারে ? পাপের ছলনা
　　ছাড়ি কভু—হয়েছ কি নত সত্য-পাশে ?

করহ উপেক্ষা—নিজ মহত্বের বলে—
　　জন্ম হতে যে বৈষম্য হয়েছে বিহিত ?
হয় যদি অভ্যুদয় নিজ চেষ্টা-ফলে,—
　　যে তোমারি শক্তি হ'তে অন্তর-নিহিত।

হের অই আত্ম-জ্ঞানী মহাত্মা যেজন
　　লভেছেন স্বরগের উচ্চতম স্থান ;
যেরূপ সুউচ্চ স্থান তাঁদেরি মতন
　　লভিবে—সন্ধান যদি কর আত্মজ্ঞান।

'সত্বা' তব—স্বরগের একটি কিরণ,
　　পরমেশ-প্রতিবিম্ব—'স্বরূপ' তোমার,
পার্থিব কর্ম্মেতে কেন হও নিমগন ?—
　　মর্ত্ত্যের আনন্দে কেন উল্লাস আবার ?

কর তবে দূর তব পার্থিব বসন,
　　হও মগ্ন একেবারে জ্ঞান-রত্নাকরে ;
তোমাতে অস্ফুট আছে শক্তির কিরণ—
　　করহ ব্যজন মৃদু তার বৃদ্ধি তরে।

ব্যক্ত এই সত্যবাণী করহ আশ্রয়,
　　স্বর্গীয় এ গুণত্রয় করহ গ্রহণ,

কর লাভ লক্ষ্য-স্থল ; যা'হতে নিশ্চয়
হবে দীপ্যমান তব 'স্বরূপ' আপন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

(২)

(প্রথম সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে ভগবানের দুই ভাব ;—ঈশভাব ঐশ্বর্য্য ও মধুর ভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি উপায়ে ভগবানের মুক্তভাব আয়ত্ত করিবে ? ইহার কি কোন উপায় আছে ? এই প্রশ্নের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপায় কি তাহা ইঙ্গিতে পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উক্ত হইয়াছে। ভগবানে ঐশ্বর্য্য ঈশভাব উপলব্ধি করিবার উপায় জ্ঞান ; এবং তাঁহার মাধুর্য্য ম ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভক্তি। এই জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

জ্ঞান অর্থে তত্ত্বজ্ঞান—তুচ্ছ বিষয় জ্ঞান বা প্রচলিত বিজ্ঞান নহে। ঐ জাতীয় জ্ঞান অনেক স্থলে নিষ্ফল বিড়ম্বনা মাত্র——শুধুই অহংকার ও বৃথাভিমানের জনক। যে জ্ঞানে ভগবানের ঈশভাব ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি হয়, সে এ জাতীয় জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান। এইজ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইবার জন্য কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। জ্ঞান মার্গের প্রথম সোপান—অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মসত্তার অনুভব। যে সত্তা জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, যাঁহাতে সৃষ্টির বিকাশ বিবর্ত্ত ও বিরাম, যিনি অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য, এক ও অদ্বিতীয়—সেই ব্রহ্মসত্তার অনুভব। ঐ ব্রহ্মপদার্থই সৎ, অন্য সকল বস্তুই অসৎ, মায়িক, ভঙ্গুর, নশ্বর—অজ্ঞ দৃষ্টিতে বহু কিন্তু জ্ঞানীর

চক্ষে একমাত্র; যে হেতু সকল পদার্থই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্, অতএব তাহারা অভিন্ন—সমান। এই সাম্যবোধ জ্ঞান মার্গের দ্বিতীয় সোপান। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। ঐকান্তিক সমতাই ব্রহ্মের লক্ষণ। অনন্তর সমতা জ্ঞান হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের অনুভূতি হয়। পঞ্চকোশের আবরণে আবৃত জীবাত্মা সর্ব্ববিধ উপাধি বিযুক্ত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এই বিবেকের উৎপত্তি হয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের ঈশ-ভাব ঐশ্বর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি* হয়। এইজ্ঞান লাভের ফল তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিং বাক্ পতিশ্চক্ষুঃ পতিঃ। শ্রোত্র-পতির্বিজ্ঞানপতিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবন্মুক্তের সম্বিৎ বিশ্বময় সম্প্রসারিত হওয়াতে সকল ভূতের চক্ষু তাহার চক্ষু হয়। শ্রোত্র তাহার শ্রোত্র হয়। বাক্য তাহার বাক্য হয়। বুদ্ধি তাহার বুদ্ধি হয়। সুতরাং সর্ব্বভূতের যাহা দর্শন শ্রবন বচন মনন তাহা তাহার দর্শন শ্রবন বচন মননের অঙ্গীভূত হয়। ইহাই স্বারাজ্য সিদ্ধি। বদ্ধ জীব স্বরাট্ হইলে ভগবানের মুক্তাত্মার সাযুজ্য লাভ করে। এবং এই রূপ সর্ব্বাত্মকতার ফলে ভগবানের ঈশভাবের অধিকারী হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। ইহাই জ্ঞান মার্গ।

ভক্তিমার্গ স্বতন্ত্র। যেমন ঘসা কাঁচের সাহায্যে তেজোময় সূর্য্যকে নয়ন গোচর করা যায়, সেইরূপ ভক্তি কাঁচ দ্বারা অচিন্ত্য ভগবানকে চিত্ত গোচর করা যায়। ভক্তির সাহায্যে মধুর ভগবানের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, নিশ্চয় বুঝা যায় যে তিনি মধুময়।

এই ভক্তি কি? 'সাপরানুরক্তি রীশ্বরে'। ভগবানে সাতিশয় অনুরাগের নাম ভক্তি। চিত্তের যে অবস্থায় ভগবানকে অতি নিজ জন বলিয়া বোধ হয়, সেই অবস্থার নাম ভক্তি। এক কথায় অনুকূল+ ভাবে ভগবানকে ভজনের নাম ভক্তি। ইহার ফলে চিত্ত শুদ্ধি।

---

* এই সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্টের ভক্তি ও অধ্যাত্ম জীবন শীর্ষক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

+ প্রতিকূল ভাবেও ভগবানের ভজন হয়। হিরণ্যকশিপু হরিকে অহরহ শত্রুভাবে চিন্তা করিয়া উত্তমগতিলাভ করিয়াছিল। শিশুপাল তীব্র বৈরহেতু সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দশ্রুকলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যাবিনাশয়ঃ।

ঈশ্বর স্মরণ জন্য রোমাঞ্চ চিত্তদ্রব ও আনন্দাশ্রুবিনা—এক কথায় ভক্তি ব্যতিরেকে কিরূপে চিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে? চিত্ত শুদ্ধির অনন্তর বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের মাধুর্য্যের আভাষ হয়। উদ্ধবগীতায় ভগবান্ ভক্তের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

বাক্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি।

অর্থাৎ ভগবদ্ ভক্তের বাক্য ভাববিজড়িত, চিত্ত বিগলিত হয়। সে কখন রোদন করে, কখন হাস্য করে। কখন বা লৌকিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গান করে এবং নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ লোকের সংযোগে ভুবন প[illegible] হয়। এ বর্ণনা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। যাঁহারা কখন ও ভক্ত-জনের হাব ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি ক[illegible]বেন। ভাগবতকার ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দ্বারা ও ইহার সত্যতা অনুমিত হইবে। যে বর্ণনা এই।

কচিদ্ রুদতি বৈকুণ্ঠ চিন্তা শবলচেতনঃ
কচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তিকচিৎ।
নদতি কচিদ্ উৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতিকচিৎ
কচিৎ তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকারহ॥
কচিদ্ উৎপুলক স্তূষ্ণীত মাস্তে সংস্পর্শ নির্বৃতঃ।
অস্পন্দ প্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ।

প্রহ্লাদ কখন ভগবানের চিন্তা কুলিতচিত্তে রোদন করিত। কখন তাঁহার

ধ্যান করিতে বাধ্য হইয়া জীবনান্তে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইল। জয় বিজয় রিপুভাবে নারায়ণের সংসর্গে আসিয়া তিন জন্মে মুক্তিলাভ করিল। ফলতঃ কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ-মৈক্যং সৌহৃদমেবচ। নিত্যংহরৌ বিদধতোযান্তি তন্ময় তাংহিতে। ভগবানে কাম ক্রোধ

মিলনানন্দে হাস্য করিত, কখন গান করিত, কখন মুক্তকণ্ঠে চিৎকার করিত। কখন নির্লজ্জের মত নৃত্য করিত। কখন তাঁহার ভবনাবেশে তন্ময় হইয়া ভগবানের লীলার অনুকরণ করিত। কখন বা ভগবানের সংস্পর্শ সুখে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রগাঢ় প্রেম জনিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিত।

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। ভগবানের নাম হৃষীকেশ—হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। অতএব সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিই তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করা যাইতে পারে। আর সকল ইন্দ্রিয়ের তাঁহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। এই ভাবেই বোধ হয় ভাগবতকার লিখিয়াছেন। "যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবন না করে হায়! তাঁহার কর্ণ দুইটি বৃথা গহ্বর মাত্র। হে সূত, যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী রসনা ভেক জিহ্বাতুল্য; যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্টকিরীট শোভিত হইলেও কেবল ভার মাত্র। হস্তদ্বারা হরির যে সেবা না করে, তাহা কনক কঙ্কনে শোভিত হইলেও শবের হস্তমাত্র। ...যের নয়ন যদি বিষ্ণু মূর্ত্তি নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূর পুচ্ছমাত্র। ...র যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে ...। আর যে জন ভগবৎ পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। ...পাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে সে নিশ্বাস থাকিতেও মৃত। ...য়! হরিনাম কীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকার প্রাপ্ত না হয় এবং বিকারে ও যাহার চক্ষে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় তাহার হৃদয় লৌহময়॥" অবশ্য এরূপ ভজনের জন্য ভগবান্ সাকার হওয়া আবশ্যক; অন্ততঃ তাঁহার ভক্তি কল্পিত মূর্ত্তি থাকা প্রয়োজন। হিন্দুদিগের ভগবানের সেরূপ বহুতর কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ইহাও বিশ্বাস যে ভগবান মায়ার মানুষ সাজিয়া রাম কৃষ্ণ প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ ভজন ভারতবাসীর পক্ষে অসাধ্য নহে। আর ভগবান্ যে একবারেই নিরাকার তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার আনন্দময় কারণ শরীর স্বীকার করিতেই হয়।

আর যাঁহারা ভগবানকে নিরাকারও ভাবেন তাঁহারাও বোধ হয় তাঁহার

ভয় স্নেহ একত্ব এবং সৌহার্দ্দি—যে কোন ভাব নিত্য হৃদয়ে পোষন করিলে, তন্ময় হওয়া যায়। বলাবাহুল্য অনুকূল ভজনই শ্রেষ্ঠ পথ।

বিশ্বরূপতা গুণাত্মকতা এবং প্রেমময়তার অপলাপ করেন না। সুতরাং হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের ভজন তাঁহাদের পক্ষে ও অসম্ভব নহে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন।

এ তীব্র কামনা কেন হায় মানুষের তরে
চাহ রূপ ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর।
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা, যাহার অনন্তরূপ
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কে সুন্দর ?

চাহ গুণ ? এই বিশ্ব যার গুণলীলা ভূমি
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার (?)
চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম পারাবার
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার !

যে ভক্তির কথা ইতিপুর্ব্বে বলিলাম, যাহার সাহায্যে ভগবানের মধুর ভ প্রত্যক্ষ করা যায়, যে ভক্তির পাঁচটি স্তর আছে ; পর পর চারিটি স্তর অ ক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্তরে—পহুঁছিতে হয়। এই স্তরগুলি যথাক্রমে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তাভাব। শান্ত ভাব সাধারণ ভক্তের ভক্তি— হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। দাস্য ভাবে ভগবানে নির্ভর—যখন ভক্ত ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে। সখ্যভাব প্রীতির উন্মুক্ত উৎস—যখন ভগবানের সহিত প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাৎসল্য ভাবে প্রীতির সহিত দয়ার অপূর্ব্ব মিশ্রন—যখন ভগবান্ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, জীবন অপেক্ষাও অধিক স্নেহের সামগ্রী হন। সর্ব্বশেষ কান্তাভাব, যে ভাবে ভক্তি প্রীতি দয়াও স্নেহের মধুর সমাবেশ—যখন হৃদয় ভগবৎ প্রেমের শতধারায় অভিসিক্ত হইয়া তন্ময়তালাভ করিয়া প্রেমাধারে বিলীন হইয়া যায়।

এই ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে সকল প্রকার সমীহা ও সাপেক্ষতা অন্তর্হিত হইয়া ভগবানকে অতি আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। ইহাই সেই অনিমিত্ত অহৈতুকী ভক্তি, যাহার স্পর্শে লৌহ ও কাঞ্চনে পরিণত হয়। ইহাই সেই মহাজনোক্ত মহা ভাব, যাহার কণামাত্র লাভের জন্য ব্রহ্মাদি

দেবতারও আগ্রহ হয়। এই ভাবের আস্বাদন পাইলে গোপীদিগের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

মধু হতে মধু　　তুমি প্রাণ বঁধু
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব,　　চরণ সেবিব
দেহ নাথ এই বর।

এই ভাবে রুচি হইলে ভগবানকে রসিকশেখর, রসময় নাগর, প্রেমময় বঁধু বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই ভাবে বিভোর হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধিকার প্রেমোন্মাদ, ভগবানে আত্ম নিমজ্জন বুঝিতে পারা যায়।

যব হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গল তূর॥
আলিপনা দিব সখি মোতিম হার।
উপহার দিব নব যৌবন ভার॥
সেজ বিছায়ে থোব বিকচ কুসুমে।
হৃদয় পাতিয়া দিব রহিবে শয়নে॥
আচলে বাতাস দিব ঘুমাইবে সুখে
সারানিশি চেয়ে রব শ্যাম চাঁদ মুখে;

---

* এই মধুরভাব বিষয়ে ভক্ত প্রবর শ্রীযুত শিশির কুমার ঘোষের একটি সুন্দর কবিতা আছে। কবিতাটি এই।—

মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমাবলে থাকে
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবেনা তোমাকে।
ভকতি ও স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি
তবে 'প্রিয়' বলি কি আর না ডাকিব আমি।
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর
বড় হ'য়ে সেসব কি করে দেবে দূর।
মায়া মিলাইয়া এস প্রভু ভগবান্
দুটা কথা কহিতবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে
'কিরূপেতে বলরাম তোমালাগ পাবে॥

ভগবানের যে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলোচনা করিলাম, তাহার অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ লীলায়। কুরুক্ষেত্র লীলায় [যাহা মহাভারতে বিবৃত] তাঁহার ঈশ্বর ভাব প্রকটিত। এবং বৃন্দাবন লীলায় [যাহা ভাগবতে বর্ণিত] তাঁহার মধুর ভাব প্রস্ফুটিত। মহাভারতে দেখিতে পাই তিনি অদ্ভুত কৌশলে খণ্ড ভারতে মহা ভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়া গীতার মহাধর্ম্ম ব্যাখা করিতেছেন, ভারত যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে আসীন হইয়া অম্লানমুখে ক্ষত্রিয় ক্ষয় সাধন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন। আর ভাগবতে দেখিতে পাই তিনি ভক্তবৎসল প্রভু, করুণাময় স্বামী, প্রীতিময় সখা, স্নেহময় পুত্র এবং প্রেমময় নাগর। মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র সুকুমার ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে—ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া প্রেম—তিনি সকলেরই উদ্দিষ্ট। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের দৈব রাসায়নিক মিশ্র[illegible] শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।

সেই জন্যই বোধ হয় তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁহার ভজনা করিলে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য উভয়বিধ ভজনের ফললাভ হয়। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে অ[illegible]রা ভারতবর্ষে জন্মিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী হইয়াছি, কারণ কৃষ্ণভক্তি আম দের স্বভাব সিদ্ধ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মৃত্যু-রহস্য।

(প্রথম সংখ্যার ৩০ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বস্তুতঃই আমি মোহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাদের ব্যবহারে যত হৌক না হৌক লাবণ্যের মোহই আমায় প্রধানতঃ মুগ্ধ করিয়াছিল। মুগ্ধই বটে কেন না আমার ধর্ম্মসূত্রে পরিণীতা স্ত্রী আজিও জীবিতা জাজ্জল্যমানা। অন্যে মোহিত হইবার আমার অধিকার ছিল না। মূঢ় আমি বিক্রীতহৃদয় পুনর্বিতরণে প্রয়াসী হইলাম।

সত্য কথা বলিতে কি আমার হৃদয় যে পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়াছিল কদাপি আমার তাহা উপলব্ধি হয় নাই। পরিণয় হইয়া থাকিলেও প্রণয় কাহাকে বলে আমি তাহা ঘুণাক্ষরে বুঝি নাই। বুঝিবার কোন অবসর ঘটে নাই। অথচ ইহারই মধ্যে আমার প্রণয় বিকার উপস্থিত হইয়াছিল।

আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার সপ্তদশ বর্ষ মাত্র বয়স। ভার্য্যা সুকুমারী কন্যকা মাত্র। বক্ষ্যমান ঘটনা কালে আমাদের বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইলেও সুকুমারীর সহিত আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাত হয় নাই।

কেন না সুকুমারী নিতান্ত বালিকা বলিয়া তাহার পিতৃপক্ষীয়েরা প্রথম বৎসরেই তাহাকে আমাদের বাটীতে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ তৎ-পরে তাঁহাদের সহিত আমাদের মনোমালিন্য ঘটাতে আমিও এ পর্য্যন্ত কখনও শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করি নাই।

মনোমালিন্য ঘটিবার কারণ এই, বহুদিন যাবৎ আমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী নানারূপ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এই সময় তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্তিম অবস্থায় তিনি সুকুমারীকে দেখিবার জন্য ভূয়োভূয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয়,—(তিনি সদর ওয়ালা)—এই সময় চট্টগ্রামে বদলী হইয়া আপন সমভিব্যাহারে কন্যাকে লইয়া চলিয়া যান, পরে পথকষ্ট লোকাভাব, দূরতা প্রভৃতি নানা ওজর আপত্তি করিয়া আমার জননীর শেষ পার্থিব অভিলাষ পূরণে প্রতিবন্ধকতা করেন।

আমার জননী স্বর্গারোহণ করিলে এই মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হইল। শ্বশুর মহাশয়ের উপর আমার একটা বিজাতীয় ক্রোধ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধিনী সুকুমারী আমার ঘৃণ্যা হইল। প্রণয় না হইতেই প্রলয় ঘটিল।

সুকুমারী যে নিরপরাধিনী আমি ক্রোধান্ধ হইয়া সে জ্ঞানও হারাইলাম। আমার মনে হইল, তাহারই প্ররোচনাতে তাহার পিতা তাহাকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। এমন স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে আর আমার বাসনা ছিল না।

এই জন্য সহজেই লাবণ্য আমার হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থা হইল। আমি দেখিলাম, বুঝিলাম, মজিলাম।

সেই স্বর্ণলতিকার শৈশব সরল ব্যবহার, অমৃত নিস্যন্দিনী সঙ্গীত লহরীও সেই দীর্ঘায়ত জ্যোতিষ্মান নয়নযুগলের লজ্জাবনত সতৃষ্ণ কটাক্ষ, সেই কোমল বিম্বাধরের স্মিতশোভা, আমায় একান্ত আকুল করিয়া তুলিল। আমি বুঝিলাম সেই জ্যোৎস্নাসার নির্ম্মিত দেহমন্দির প্রদীপ্ত কুসুম সুকুমার হৃদয় খানি লাভ না করিলে আমার জীবন মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। আমি মোহে আচ্ছন্ন হইলাম।

আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, হৃদয় প্রতিদানই যথার্থ বিবাহ, পূর্ব্বরাগ ভিন্ন বিবাহ একটা ঘোরতর কুসংস্কার। লাবণ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমায় হৃদয়দান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। সেই আমার প্রকৃতপত্নী। আর সুকুমারী? —তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? মাষ্টার মহাশয়ের কথার প্রতিবর্ণই সত্য। হাতে হাতে সুতা বাধিয়া দিয়া দুইটা অবোধ্য মন্ত্র পড়িয়া দিলে আজীবন সম্বন্ধ গ্রথিতে পারে—ইহা নিতান্ত বাতুলের কথা। যে [illegible] আমাদের বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমরা উভয়ই অপক্কবুদ্ধি, অপ্রাপ্তবয়, উদ্বাহক্রিয়ার মর্ম্মমাত্র বুঝি নাই, আমাদের বিবাহই পণ্ড। অতএব লাবণে[illegible] করলাভের জন্য আমি সুকুমারীকে চিরতরে বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল ভুলিলাম। লাবণ্যের রূপ আমার ধ্যান, তাহার নাম আমার জপ হইল। আমি অহর্নিশি তাহার প্রীতি কামনা করিতে লাগিলাম। তাহার প্রীতি বিধানার্থ আমি জীবন উৎসর্গ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাষ্টার মহাশয় আমার এই চিত্তবিকার লক্ষ্য করিতেছিলেন। প্রত্যুতঃপক্ষে তিনি তাহা জানুন না জানুন, তিনিই ইহা ঘটাইয়াছিলেন। কেননা, লাবণ্য আমার নিকট সর্ব্বদা আসিলে বসিলেও সে যে আমার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি না বুঝাইয়া দিলে আমি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতাম না, আর তাহা না জানিলে বালিকার সকল সেবা যত্নই আমি চিরদিন কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুরূপ

ভাবিয়া কদাপি তাহার প্রতি অন্য ভাবাপন্ন হইতাম না। যাহা হৌক যখন অন্য ভাবাপন্ন হইলাম,—দেখিলাম, বুঝিলাম মজিলাম—আর মাষ্টার মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন—আমার তাহাতে সাহায্যই হইল।

আমি সহজেই লাজুক, তাহার উপর এই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল, অতএব মুরারীবাবুর অনুপস্থিতিকালে এসকল কথার উত্থাপন করা দূরে থাক্, এ সকল ভাবনা মনে হওয়াই আমি পাপ বিবেচনা করিলাম।

এদিকে লাবণ্য দিন দিন আমার প্রতি অনুরাগের নূতন নূতন নিদর্শন প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমেই সকল লক্ষণ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর আকার ধরিতে লাগিল। যখন এসকলের অর্থ কিছুই বুঝি নাই তখন আমার মনোভাবের কিছুই ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার চক্ষু ফুটিয়াছিল,—সুতরাং এক্ষণে লাবণ্যের মুখে।

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও"—

প্রভৃতি গান আর নিরর্থক মনে হইতে লাগিল না, এক্ষণে তাহার প্রদত্ত পশমের জুতায়—"ভুলনা আমায়"—কেবল প্যাটার্ণের অনুকরণ বলিয়া আর স্বীকার করিতে পারিলাম না, আমি মনের ভাব মনে চাপিতে লাগিলাম—সদাই লাবণ্য হইতে অন্তর থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মাষ্টার মহাশয় তাহাও লক্ষ্য করিলেন।

পর বারে মুরারী বাবু আসিলে মাষ্টার মহাশয় কথা প্রসঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের কথা তুলিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক আর একবার এই বিবাহ লইয়া মুরারী বাবুর সঙ্গে আমাদের অনেক ক্ষণ বাদানুবান হইয়াছিল, তখন সে তর্কের উপলক্ষ্য বিশেষ কি আমি ঠাওরাইতে পারি নাই, অতএব সরলভাবে আমিও নিজ মতামত অভিব্যক্ত করিতে ক্রটী করি নাই। সেই তর্ক হইতে বুঝিয়াছিলাম মুরারী বাবু বিবাহে মনোনয়ন প্রথার পক্ষপাতী অর্থাৎ পাত্র পাত্রী স্বেচ্ছামত নিজ নিজ পতি পত্নী নির্ব্বাচন করে ইহাই তাহার ইচ্ছা। তবে পিতামাতার অমত না থাকে এইটুকু মানা উচিত। একথাও বলি, সুকুমারীর সহিত আমার অত্যন্ত সহসা বিবাহ হইয়াছিল, সে বিবাহের যে ফল সুখকর হয়

নাই। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আমার বিধবা জননীকে এই সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে—এই প্রকার মতও তিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন আমার মনে তাহা জাগরূক ছিল, বিশেষতঃ এপর্য্যন্ত সুকুমারীর রূপ বা গুণ সম্বন্ধে আমি কোনই জ্ঞান লাভ করি নাই, সুতরাং মুরারী বাবুর মতের যুক্তিবেত্তা আমার একরূপ স্বীকার করিতে হইয়াছিল এই উপলক্ষে মাষ্টার মহাশয় মুরারী বাবুর সাম্নমোদনে বলিয়াছিলেন যে——

হিন্দু বিবাহে এই প্রথা অবলম্বিত না হওয়াতে, যে বিশেষতঃ অপ্রাপ্ত বয়সে পাত্র পাত্রীর জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়াতে সে বিবাহই অসিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার মনে আছে সে সময় তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার কন্যার বিবাহ তিনি এই স্বেচ্ছানির্ব্বাচন প্রথাই অবলম্বন করিবেন।

যাহা হৌক এক্ষণে লাবণ্যের নাম করিয়া এই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তৎসম্বন্ধে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং মুরারী বাবুর মতামত শুনিতে আমি সহজেই ব্যগ্র হইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—"লাবণ্যের বিবাহের জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত নহেন, তবে তেমন মনোমত বর জুটে, বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন"।

মাষ্টার। "কিরূপ বর আপনার মনোমত ?"

মুরারী। "লাবণ্য যেরূপ সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা রাজা রাজড়ার ঘরেই তাহার বিবাহ হওয়াও উচিত"—(আমি মনে মনে তাহা স্বীকার করিলাম)—"আর আমি দিবও সেইরূপ পাত্রে, (আমি মনে মনে হতাশ হইলাম)।

মাষ্টার। "আপনার কন্যার যদি সেরূপ ইচ্ছা না থাকে," ?—মাষ্টার মহাশয়কে মনে মনে শত সাধুবাদ দিলাম—তিনি যেন আমার মনের কথা, টানিয়া বলিলেন।

মু। "না থাকিবার কারণ কি হইতে পারে"?

মা। কি কারণ কেমন করিয়া বলিব ? কথার কথা বলিলাম মাত্র। আপনিত বিবাহে মনোনয়ন প্রথার পক্ষপাতী, যাহারই সঙ্গে বিবাহ দিন অগ্রেত কন্যাকে পাত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। মনে করুন আপনার

কন্যা পাঁচটা পাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে করিতে কোন পাত্র-বিশেষের রূপে মুগ্ধ হইল, সে রাজা রাজড়া না হইল ?

মু। রাজা রাজড়া না হইলে পাত্রই আনিব না।

মা। আপনিত আনিবেন না—কিন্তু এরূপ কোন পাত্র যদি সহসা আপনার কন্যার দৃষ্টি পথে পড়িল—তারপর ? সুপুরুশ, সদৃশবর্ণ, বিদ্বান, চরিত্রবান রাজা রাজড়া পাওয়া কি সুকঠিন মনে করেন না ? এসকল বিষয়েও ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

মু। নিশ্চয়, তাহাই অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য।

মা। তবে ?

মু। তবে আর কি ? আমিত এক্ষণেই বিবাহ দিতে ব্যস্ত নহি, সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট পাত্র না জুটিলে বিবাহ দিবনা, সন্ধান করিতে করিতে ক্রমে পাত্র জুটিবে। আমি লক্ষ টাকা যৌতুক দিব—কোন উন্নত ভাবাপন্ন রাজা রাজড়া জুটিবে না কি ?

মা। কন্যাত বয়স্থা হইয়াছে ? কতদিন অপেক্ষা করিবেন।

(লাবণ্যাকে দেখিলে পঞ্চদশবর্ষীয়া বোধ হইত)।

মু। সেইটাই ভাবনার কথা। গৃহিণীও এইজন্য একটু ব্যস্ত হইয়াছেন। বাল্যবিবাহে আমার বিরাগ, সেই জন্য এতদিন এ বিষয়ে বড় একটা ভাবি নাই, কিন্তু এক্ষণে গৃহিণীর ব্যগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আর বুঝাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। দেশে একটু নিন্দাও হইতেছে।

মা। পাত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত কি আপনারই অনুরূপ ?

মু। তাঁহার মতের কথা বলিবেন না। মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—গৃহিণীর ইচ্ছা——(আমার দিকে চাহিয়া)——বাবাজি তোমারই হস্তে লাবণ্যাকে সমর্পণ করেন।

এই কথা শুনিবা মাত্র আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমি অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া যাইবার জন্য আসন পরিত্যাগ করিতে যাইতেছি—মুরারী বাবু আমার হাত ধরিয়া পুনরপি বলিলেন—

"তাহাতে আর লজ্জা কি ? তাহাতে তোমার লজ্জা কি ? সেত আর হইবার নহে।

মা। হইবার নহে কেন ?

আমি আরও বিপদে পড়িলাম।

মুরারী বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"সে কি মহাশয়, হইতে পারে না কি ? বাবাজী তুমি কৃতদার না আমি শুনিয়া ছিলাম ?"

আমি কথার উত্তর না দিয়াই সত্বর উঠিয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলাম—মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"তা বটে কিন্তু তাহাতে যদি বিঘ্ন না ঘটে আপনার অন্য কোন আপত্তি আছে ?"

আমি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মুরারী বাবু খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন শুনিতে পাইলাম—

"আপত্তি ? আপত্তি কিন্তু থাকিতে পারে ? কিন্তু বিঘ্ন না ঘটিবে কি প্রকারে ? মাষ্টার মহাশয় কি চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন আমি আর স্পষ্ট কোন কথাই শুনিতে পাইলাম না—কিন্তু কথাটা যে কি আমার বুঝিতে বাকী রহিল না—বোধ করি বুদ্ধিমান পাঠকেরও রহিল না। ''

অনেক ক্ষণ ধরিয়া এইরূপ মৃদুস্বরে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল——আ মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিতে তাদৃশ উদ্গ্রীব না হই, মুরারী বাবু কি উত্ত দেন শুনিতে না পাইয়া বড় অস্থির হইতে লাগিলাম।

যাহা হোক মুরারী বাবুর শেষ কথা গুলি আমার কর্ণে গেল—তিনি বলিলেন—কন্যার সুখের জন্য তিনি সকলই করিতে প্রস্তুত—এসকল বিষয়ে কন্যার পূর্ব্বরাগ বুঝিয়া কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

মুরারী বাবু উঠিয়া যাইবার সময় এই গুলি বলিলেন।

আমার গৃহের ভিতর দিয়াই পথ, তিনি যাইবার সময় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত লক্ষ্য করিলাম।

(ক্রমশঃ)—

শ্রীভঃ—

সঙ্গীত।

প্রাণ ভোরে শুধু ডাক্‌লে তাঁরে
(তোর) অভাব যত জন্মের মত ঘুচে যাবে একেবারে।
ভয় কি তোমার অবোধ মন
তিনি যে ভয়ের ভয় নিবারণ!
(তুমি) হওনা কেন যতই দোষী
তর্‌বে তাঁর চরণ ধ'রে।
তাঁহার কাছে কপট ভুলে
মনের কথা বল্‌লে খুলে,
(তিনি) মুছিয়ে তোমার মলিন দেহ
কর্‌বেন কোলে আদর ক'রে।
(তোমার) গর্ব্ব কর্‌বার নাইক কিছু
(তাই) দাঁড়িয়ে পিছে নয়ন নীচু—
(আছে) জীবের ধর্ম্ম দুর্ব্বলতা
সে জন্যে আর ভেবোনারে।
(তুমি) সকল শান্তি লভ; সঁপে
তাঁর চরণে আপনারে।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(২)

কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১৬ ক্রোশ দূরে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথায় অনেক গুলি ভদ্র পরিবারের বাস। এই লোক সমূহের মধ্যে মুখোপাধ্যায় বংশীয় কোন যুবার বিবাহোপলক্ষে লেখক সেই গ্রামে গমন করেন; সে আজ ২০ বৎসরের কথা। পাত্রী পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান অন্য কোন গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশোদ্ভবা। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। যথারীতি সমা-

রোহের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে পর-দিবস বর ও কন্যা যোড়ে বরের বাটীতে গমন করিলেন। বরযাত্রীগণের সহিত লেখক ও বরের বাটীতে আসিলেন। বিবাহের অবশিষ্ট ক্রিয়াদি সম্পাদিত হইবার পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজন করিয়া সেদিবস তথায় রাত্রযাপন করিলেন। পরদিন নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় সকলে শুনিলেন যে, নববধু তাঁহার দিদিশাশুড়িকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছেন। নব বধু বলেন যে, বরের বাটী তাঁহার বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে বাটীর ভিতরের প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি ধান্যের গোলা ছিল ও উঠানের নৈঋত কোণে একটি পিয়ারাগাছ ছিল, আর খিড়কাদ্বার হইতে নির্গত হইয়া বাম পার্শ্বে একটি আতা গাছ ছিল। বাটীর বৃদ্ধা কর্ত্রী অর্থাৎ বরের পিতামহী বলেন যে গোলাও বৃক্ষাদি প্রভৃতি বিষয় নববধু যেরূপ বর্ণনা করিলেন ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতই সেইরূপই ছিল ; কিন্তু নব বধু তখন দশম বর্ষীয়া বালিকা ও তাঁহার পিতা প্রভৃতি সকলেই বরের অভিভাবকগণের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তবে ইহা কি ? ইহা কি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার নহে ?

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

একটী গান।

পিলু—ষৎ।

জাগো জাগো মাগো, ওগো কুলকুণ্ডলিনি।
ছাড়োগো কপট নিদ্রা স্বয়ম্ভু সোহাগিণী॥
অনিদ্রা অতন্দ্রা তুমি, গুরু মুখে শুনেছি আমি,
নিদ্রা তন্দ্রা সকলই তোর ছলনা জানি জননী।
জীব চক্ষে নিদ্রা দিয়ে, অহং সং সাজাইয়ে,
ঘুমের অভিনয় মাত্র করিছ হরমোহিনী।
(যদি) জাগিবেনা ছিল মনে, (তবে) জাগালি কেন সন্তানে,
তনয় কাঁদিলে কোথা ঘুমায়ে রহে জননী।
বারে বারে যাই আসি, ঘুমাই মাত্র অহর্নিশি,
(ঘুম) ভাঙ্গালি তাই দুখে ভাসি, না হেরে তোরে তারিণী।
দীন রাম বলে তারা, আর মুদিবনা নয়ন তারা,
তারা ভাবে নিদ্রা হারা হয়েছি যে নিস্তারিণী॥

শ্রীরামলাল দত্ত।

১ম ভাগ।] আষাঢ়, ১৩০৪। [৩য় সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়।
৩৯।১নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

—২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট বিভাবতী প্রেসে
শ্রীসন্ন্যাসীচরণ বৈরাগী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ একটাকা, মফস্বলে ১৷৵০ আঠার আনা।
প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। প্রতি মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে "পন্থা" প্রকাশিত হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ আমাদিগকে জানাইবেন, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক নম্বর।

৪। টাকা-কড়ি ও পত্র প্রবন্ধ সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৫। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৬। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। গ্রাহক হইবার জন্য যাঁহারা মনি-অর্ডার পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কুপনে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৭। "পন্থায়" বিজ্ঞাপন দিবার সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়
৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।
প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে, পত্র লিখিলে অথবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত বন্দবস্ত হইয়া থাকে।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

জন্মান্তর রহস্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নূতন মূল্য।৶০ ছয় আনা।

The book before us deals with the subject of re-births. The book is published as the first instalment of a series of theosophical publication in Bengali which Babu Aghor Nath Datta undertakes to bring out, in order to eradicate the erroneous belief that the cultivation of "Theosophy" has the effect of undermining one's faith in Hinduism. The subject chosen, as the first instalment of the serial, is a happy one, * * how the theory of re-incarnation, maintained by theosophists, receives its support from the Hindu Shastras, and how the Shastras are broad-based on science and universal truth.

INDIAN MIRROR

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, ৩৯।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

১ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩০৪। | ৩য় সংখ্যা।

"কঃ পন্থাঃ" ?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু সেদিন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে "কঃ পন্থাঃ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আমি সে প্রবন্ধ পড়ি নাই, সে দিনকার হিতবাদীতে দেখিলাম যুধিষ্ঠিরের ন্যায় চন্দ্রবাবুও ঐ প্রশ্নের মীমাংসায় বলিয়াছিলেন,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

হিতবাদীতে দেখিলাম 'মহাজন' শব্দের অর্থ এ স্থলে কি—তাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। মহাজনের আভিধানিক অর্থ সাধু, বহুজন, বণিক। অবশ্য এস্থলে বণিক অর্থ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কেননা "কঃ পন্থাঃ" ? যে ধর্ম্ম পথ বা সত্য পথ (true path) সম্বন্ধে প্রশ্ন তাহা আমরা সকলেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে মহাজন অর্থে—সাধু না বহুজন ?

চন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন 'মহাজনের' এস্থলে অর্থ "সাধু"। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, এস্থলে মহাজন অর্থ "বহুজন"। এই জন্যই

তর্ক উঠিয়াছে। তর্ক করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কেননা তর্কে প্রকৃত সত্য জানা যায় না। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠ।" আমাদের এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে জিজ্ঞাসু তাহার মনে প্রথমেই এ প্রশ্ন উপস্থিত হয়—"কঃ পন্থাঃ"। সে তাহার নিজের জ্ঞানালোকে যতদূর দেখিতে পায় তাহা হইতে এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিয়া লয়। আমি নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইতে এই প্রশ্নের যাহা মীমাংসা করিতে পারিয়াছি তাহা পন্থার পাঠকগণকে বিনীত নিবেদন করিব। আশা করি তাঁহারা সকলেই এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিয়া লইবেন।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবান তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্নের মীমাংসা অপেক্ষাকৃত সহজ সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই স্বয়ং ধর্ম্মই বকরূপে যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। এবং যুধিষ্ঠির যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহাও ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতএব যুধিষ্ঠিরের উত্তর বুঝিতে পারিলে আমাদের এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সে উত্তর বুঝাও যে সহজ নহে তাহা উল্লিখিত তর্ক হইতে বুঝা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেকে আপন আপন জ্ঞানালোক অনুসারে এই উত্তরেরও করিয়া লয়।

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। ইহাতে প্রথম প্রশ্ন—এই মহাজন অর্থে বহুজন হইতে পারে কি না? অনেকে বলিতে পারেন, যখন টীকাকার নীলকণ্ঠ এই অর্থ করেন—তখন ইহাই সঙ্গত। কিন্তু নীলকণ্ঠ আপ্ত ঋষি নহেন—সামান্য টীকাকার মাত্র। সর্ব্বত্র তাঁহার অর্থ যে গ্রহণ করিতে হইবে—এমন কোন কথা নাই। গীতার শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ অনেক ভাষ্যকার ও টীকাকার আছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। অনেক স্থলে আমাদের শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহা পণ্ডিতের অর্থও অগ্রাহ্য করিয়া অন্য টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অতএব নীলকণ্ঠের অর্থ যে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কথা নাই।

যদি মহাজন অর্থে বহুলোক হইত, তবে আমাদের বলিতে হইত যে, যে পথে বহুলোকে গিয়াছে, সেই পথে যাইতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, বহু লোকেই অধর্ম্ম পথে গিয়া থাকে। আজ কালের বোধ হয় শতকরা

নিরানব্বই জন অধর্ম্ম পথে যায়। কলির প্রথমে যখন যুধিষ্ঠির ছিলেন, তখন তাঁহার সময়েও যে অন্ততঃ বার আনা লোক অধর্ম্ম পথে যাইত, শাস্ত্র হইতে তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আজ কালের লোক—বিশেষতঃ যাহারা শিক্ষিতাভিমানী—তাহারা অধিকাংশই নাস্তিক। সেকালে চার্ব্বাক মত প্রচলিত ছিল;—

"যাবৎ জীবেৎসুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

চার্ব্বাক সম্প্রদায় ধর্ম্ম মানিত না—পরকাল মানিত না—কেবল স্বার্থ বা আত্মসুখ চেষ্টায় পরিচালিত হইত। এখন জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক পৃথিবীর অধিকাংশ লোক, বোধ হয় পনের আনারও অধিক, এইরূপ অধর্ম্ম পথের পথিক। অতএব যদি বহু লোক যে পথে যাইতেছে বা গিয়াছে সেপথে আমাদের যাইতে হয়—তবে ত আমাদের অধর্ম্ম পথেরই পথিক হইতে হয়।

আর যদি বলা হয় যে যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় বা প্রস্থানভুক্ত লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া সেই প্রস্থান অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা হইলে ত আমাদের বৌদ্ধ হইতে হয়। কেননা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বহুজন ও ইংরাজী "mob" প্রায় একার্থ জ্ঞাপক। তাহা হইলেও আধুনিক নিয়মে "majority" বা বহুলোকের মতে মত দিতে হয়—বহুলোকের মতে কার্য্য করিতে হয়। লৌকিক ব্যাপারে এই নিয়ম সঙ্গত হইলেও পারলৌকিক ব্যাপারে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অতএব যাহারা সাধারণ লোক তাহারা শ্রেষ্ঠের পথই অবলম্বন করে। সাধারণ লোকই বহুলোক। শ্রেষ্ঠের সংখ্যা অতি অল্প। গীতায় আছে;—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

অতএব লক্ষের মধ্যে একজনও তত্ত্বদর্শী থাকেন কি না সন্দেহ। আর সেইরূপ তত্ত্বদর্শীর নিকটই জ্ঞান উপদেশ লইতে হয়।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অতএব আমরা সামান্য বুদ্ধিতেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে যখন সংসারের বহুলোকই অধর্ম্ম পথে যায়—কেবল অল্পলোক মাত্র ধর্ম্ম পথে যায়—তখন ধর্ম্ম পথে বা সত্য পথে যাইতে হইলে—বহুলোকের পথে যাওয়া চলে না। সুতরাং মহাজন অর্থে বহুজন হইতেই পারে না।

কাজেই মহাজন অর্থে সাধু বলিতে হইবে। কিন্তু এ অর্থেও গোলযোগ আছে। নহিলে তর্ক উঠিত না। সেই গোলযোগ বুঝিতে হইলে ধর্ম্মের "কঃ পন্থাঃ" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের উত্তর এই ;—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োবিভিন্না।
নৈকো মুনির্যস্য মতং প্রমাণং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অর্থাৎ "তর্কে সত্য স্থাপিত হয় না, শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন বা তাহাতে বিভিন্ন পথ উক্ত হইয়াছে, একজনও মুনি নাই যাঁহার মত প্রামাণ্য ; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।" এস্থলে মহাজন অর্থে সাধু ধরিলে হঠাৎ বোধ হয় যে তবে মুনিঋষিগণ সাধু নহেন। এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা আমাদের বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা জানি শ্রুতিতে বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ শ্রুতিতে উক্ত পথ কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দ্বিবিধোহি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ"।

মুনিগণ রচিত স্মৃতি পুরাণাদি 'অনুমান' শাস্ত্রেও সেইরূপ নানা পথের ব্যবস্থা আছে। বেদের কর্ম্মমার্গ ও স্মৃতি পুরাণোক্ত মার্গ অধিকাংশই সকামিক।

আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে যাহারা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন তাহারা ত আদৌ ধর্ম্মপথে যাইতেই পারে না। তাহারা যথেচ্ছাচারী, কোন ধর্ম্মই মানিতে পারে না। যাহাদের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সাত্ত্বিক—যাহারা কতক পরিমাণে দৈবীসম্পদযুক্ত তাহারাই ধর্ম্ম পথে যাইতে পারে, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত

হইতে পারে। সাধারণতঃ মানুষ ধর্ম্ম পথেও স্বার্থ চালিত হয়। তাহারা ইহ পরকালের সুখের জন্য ধর্ম্ম সাধনা করে, ইহারা সকাম সাধক। গীতায় আছে—

"কামৈ স্তৈ স্তৈ হৃ´তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তা স্বয়া॥"

এই সকল অজ্ঞানীর জন্য যে সকল সকাম পথ বা সাধনার নিয়ম ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহাও বেদে ও স্মৃতিতে এবং পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল অল্পবুদ্ধি প্রকৃতি-পরিচালিত লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার প্রভেদ আছে। তদনুসারে তাহাদের জন্য কাজে কাজেই বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা নিজে কোন পথ বাছিয়া লইতে পারে না। তাহাদের উপযুক্ত পথে জ্ঞানীগণই উক্তরূপ ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। তাহারা জিজ্ঞাসু নহে। তাহাদের মনে "কঃ পন্থাঃ" এরূপ প্রশ্ন উদয় হয় না। তাহার মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ উদয় হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেন না তাহারা কথনও তাহার মীমাংসা করিতে পারিবে না কেবল ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইবে। এই জন্য গীতায় আছে—

"ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

সাধারণ লোকের গতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য হেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা আছে বলিয়া সেই সকল শাস্ত্র যে অগ্রাহ্য যোগ্য অথবা সেই সকল শাস্ত্র প্রকাশক মুনি ঋষিগণ যে ভ্রান্ত বা অসাধু তাহা বলিবার কোন কারণ নাই। যিনি যে শাস্ত্র যে উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য বুঝিলেই আমরা এ কথা বুঝিতে পারি।

ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে কেবল শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া যদি আমরা নিজ বুদ্ধিতে তর্ক যুক্তির সহায়ে কোন্ পথ আমাদের অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে যাই তবে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। শাস্ত্র বিহিত বিভিন্ন সাধন পথ মধ্যে আমাদের নিজ গন্তব্য পথ আমরা কথনই নিজ বুদ্ধিতে বাছিয়া লইতে পারিব না।

শাস্ত্র আলোচনা হইতে যে প্রকৃত পথ পাওয়া যায় না তাহা টীকাকার

নীলকণ্ঠই দেখাইয়াছেন। তিনি দেবীভাগবতের টীকায় একস্থলে (নবমস্কন্ধের উপক্রমণিকায়) বিভিন্ন পুরাণ মধ্যে বিভিন্ন মত-বিরোধ ইত্যাদি লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বিভিন্ন পুরানোক্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে বিযুদ্ধ মত হইতে লোকের পুরাণাদির প্রতি যাহাতে আস্থা হ্রাস হয়, তাহাই পুরাণকারদের উদ্দেশ্য ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে * * * সকল পুরাণে সৃষ্টির একরূপ বিবরণ থাকিলে ও তাহার একত্ব সিদ্ধ হইলে, জগৎ সত্য বলিয়া ধারণা হইতে পারিত। এ ধারণা যাহাতে না হয় জগৎ যাহাতে অনার্বচনীয় মায়ামূলক বলিয়া ধারণা হয়, এজন্য বিভিন্ন সৃষ্টিক্রম ও বিভিন্ন সৃষ্টির কারণ কল্পিত হইয়াছিল। পুরাণের এইরূপ বিরোধের ন্যায় বেদেও বিরোধ আছে। বেদের কোন শাখায় প্রাণের মুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে কোন শাখায় অগ্নির মুখ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে—এইরূপ। এই বিরোধ ও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ভঞ্জন করিতে হয়।"

অতএব বলা যাইতে পারে যে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা ধর্ম্মপথ পাওয়া যায় না। বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান হইতে অনেক সময় আমাদের শাস্ত্রালোচনা প্রবৃত্তি হয়। আর শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সেই অভিমান আরও বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্ম পথে শাস্ত্র পাঠ বাসনা ব্যসন মধ্যে গণ্য। গীতার ব্যাক্ষাকার মধুসুদন এক স্থলে বলিয়াছেন—আমাদের বাসনা ত্রিবিধ ;—লোকবাসনা, শাস্ত্র বাসনা ও দেহবাসনা। এই শাস্ত্রবাসনাও ত্রিবিধ—পাঠব্যসন, বহুশাস্ত্রব্যসন ও অনুষ্ঠান ব্যসন। "শাস্ত্র পাঠে পাণ্ডিত্যাভিমান জন্মে। কাজেই শাস্ত্র পাঠ বাসনা মলিন। এই জন্য মধুসুদন এই শাস্ত্রপাঠ ব্যসন সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"মলিনত্বং চ অস্য ক্লেশাবহত্বাৎ।
পুরুষার্থানুপযোগিত্বাৎ, দর্পহেতুত্বাৎ, জন্মহেতুত্বাচ্চ ॥"

এই জন্য আমরা বুঝিতে পারি যে কেবল বিভিন্ন শাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা ধর্ম্ম-পথ পাওয়া যায় না। তর্কের দ্বারা সে পথ প্রতিষ্ঠা হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বেদাদি সকল শাস্ত্রই অবিদ্যামূলক। প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান উদয় হইলে দ্রষ্টা দৃষ্ট থাকে না শাস্ত্র থাকে না। দ্বৈত জ্ঞানেই শাস্ত্র থাকে—দ্বৈত জ্ঞান অবিদ্যা-মূলক। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধশাস্ত্র, সমুদায় মোক্ষ শাস্ত্র—সমস্তই অবিদ্যাপর, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও

অবিদ্যা প্রতিপাদক। ... প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয়।—

"তস্মাদ্ অবিদ্যাবদ্ বিষয়ানি এব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রানি চেতি।" এই জন্যই গীতায় "বেদবাদে রত যাহারা—তাহাদিগকে কামাত্মা স্বর্গপর ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রসক্ত বলা হইয়াছে। এই জন্য শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

আর এই জন্যই বোধ হয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"

অর্থাৎ "যাঁহারা অবিদ্যাকে উপাসনা করেন তাঁহারা অল্প অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা বিদ্যাতে অনুরক্ত তাঁহারা তাহা অপেক্ষাও অন্ধকারে প্রবেশ করে।" (ঈশোপনিষদ, ৯)।

অতএব যদি আমরা ধর্ম্মপথে যাইতে চাই তবে পণ্ডিতের কাছে গিয়া শাস্ত্রের অভিমত জানিবার প্রয়োজন করে না। অথচ নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের বিভিন্ন পথের বিবরণ জানিবার বড় আবশ্যক করে না। তাহাতে আমাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অন্ধকার হইতে গাঢ় অন্ধকারে যাইতে পারে।

তাহার পর যদি বলা যায় যে শাস্ত্র বিশেষ হইতে আমরা প্রকৃত পথ কি তাহা জানিতে পারি। তাহাতেও সেই পথ পাইবার বিশেষ উপায় হইবে না। যখন আমাদের শুভইচ্ছার উদয় হয় ধর্ম্ম পথে যাইবার জন্য প্রাক্তন সংস্কারের বলে যখন আমাদের প্রবৃত্তির উদয় হয় তখন শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিতে আমাদের প্রথম চেষ্টা হয় সত্য। তখন অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমরূপ পথে যাইতে সত্যানুসন্ধান করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আমরা ক্রমে বুঝিতে পারি যে বাসনাজাত শাস্ত্র আলোচনা প্রবৃত্তি হইতে প্রকৃত পথ পাওয়া যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যদি শাস্ত্র আলোচনা ধর্ম্মপথ না হয় তবে ধর্ম্ম পথ কি ? ধর্ম্ম পথ সাধনায়। ধর্ম্ম সাধনার দ্বারা এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের ক্রমোন্নতি হইয়া ক্রমে সে ঈশ্বরত্বে বা ব্রহ্মত্বে পরিণত হইতে পারে। অতএব যেরূপ সাধনার দ্বারা জীবের এই ক্রমোন্নতি হয় তাহাই ধর্ম্ম পথ। কেবল জানায় এই

উন্নতি হয় না। আমাদের অন্তঃকরণে যে শক্তি নিহিত আছে (জর্ম্মান পণ্ডিত সোপেনহর যাহাকে will বলিয়াছেন) তাহাই আমাদের মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের বীজ আমাদের সংস্কার স্বভাব বা প্রকৃতি। এই প্রকৃতির উন্নতি সাধনই ধর্ম্মপথ। আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধি যে আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত নহে অথবা কেবল স্বভাবের অধীন তাহা আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তবেই এ কথা বুঝা যাইবে।

আমরা অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি যে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করে কার্য্যকালে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের নিজ চিত্তের উপর আয়ত্বতা নাই সেই চিত্ত আমাদের ঐ অজ্ঞাত স্বভাবরূপ শক্তির অধান। আমরা মনে করি আমরা স্বাধীন জীব—আমরা ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি। যখন দেহ ইন্দ্রিয় চিত্ত আমাদের নিজের তখন তাহাদের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। কিন্তু সহজেই আমাদের সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আমরা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি যে সাধারণতঃ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই প্রবৃত্তির পথে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। বুদ্ধি আমাদের এক পথে লইতে চাহে কিন্তু প্রবৃত্তি আমাদের বীপরীত পথে চালিত করে। কাজেই কর্ত্তব্য পথে ধর্ম্ম পথে যাইব মনে করিলেই আমরা সে পথে যাইতে পারি না। আমাদের প্রকৃতি আমাদিগকে বাধা দেয়। তাই গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মনা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ—

অতএব পথ জানিলেও পথে যাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবকে সাধনাবলে নির্ম্মল করিয়া সাধু হইয়াছেন তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলে তবেই ধর্ম্ম পথে যাওয়া সম্ভব হয়। পথ জান আর না জান বিনি ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে পারিয়াছেন সেই সাধু পথদর্শকের পথে যাইতে পারিলে আর কোন রূপ বিঘ্ন থাকে না—পথ হারাইয়া যাইবার ভয় থাকে না। তাহা হইলেই পথ পাওয়া যায়।

মানবের যখন শুভ ইচ্ছার উদয় হয় যখন সংসার বিদেশে বিদেশীয় বেশে ভ্রমণ করা অকারণ মনে হইয়া নিজ নিকেতনে যাইতে ইচ্ছা হয়—তখনই মানব পথের অনুসন্ধান করে। এই পথের সম্বন্ধে এক ব্রহ্মসংগীতে আছে।

"সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম।
শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে দেখাইবে পথ।
সে পান্থনিবাসীগণে।"

ধর্ম্ম পথে যাইতে হইলে এই সাধুসঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত পথ পাওয়াই যায় না। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ সাধু সঙ্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—

"অধ্যাত্মবিদ্যাধিসমঃ সাধু সঙ্গম এবচ
বাসনা সংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দ নিরোধনং।
এতস্তা যুক্তযঃ স্প[illegible] সন্তি চিত্তজয়ে কিল।"

চিত্ত জয় করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে এই কয়েকটী সোপান অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয় যথা (১) অধ্যোত্মবিদ্যাধিগম। (২) সাধুসঙ্গম। (৩) বাসনা পরিত্যাগ। (৪) প্রাণস্পন্দ নিরোধ।

আমরা জ্ঞানপথ কর্ম্মপথ ভক্তিপথ যে পথেই যাই না কেন, আমাদের সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তাঁহারাও জ্ঞান পথে যাইবার জন্য শ্রবণ মননের উপদেশ দেন। শ্রবণ—অর্থাৎ পণ্ডিত বা সাধুর নিকট পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়। নতুবা জ্ঞান পরিপাক হয় না। আমাদের মন বড় চঞ্চল। ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে সেই চাঞ্চল্য দূর করিতে হয়। তাহার উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য।—গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

এই অভ্যাসের প্রধান সহায় সাধুসঙ্গ। এইরূপ জ্ঞানবাদীর ন্যায় ভক্ত বৈষ্ণব ও সাধু সঙ্গের প্রয়োজন পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী —গীতার টীকায় একস্থলে বলিয়াছেন।

"যস্ত বোধিতমপি তত্ত্বং ন সম্যগ্ বুধ্যতে, যোঽবা বিস্মরতি, তয়ো সাধু সঙ্গম এবোপায়ঃ।

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান অন্তরে পরিস্কাররূপে স্ফুরণ হইবার জন্য এবং তাহা যাহাতে

বিস্মরণ না হয় সে জন্য সাধু সঙ্গমের প্রয়োজন। ধর্ম্মপথে যাইবার জন্য সাধু সঙ্গমই একমাত্র উপায়।

সাধু সঙ্গম সহজে মিলে না, সাধু সঙ্গমে প্রবৃত্তিও সহজে হয় না। মধুসূদন বলিয়াছেন—

"যস্তু বিদ্যামদাদিদুর্ব্বাসনয়া পীড্যমানো ন সাধুমনুবর্ত্তিতুমুৎসহতে, তস্য পূর্ব্বোক্ত বিবেকেন বাসনাপরিত্যাগ এবোপায়ঃ।"

যতক্ষণ বিদ্যা ঐশ্বর্য্য মদ থাকে, বাসনা প্রবল থাকে, ততদিন সাধু সঙ্গে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব যতদিন সাধুসঙ্গ না মিলে, যতদিন সাধুকে অনুসরণ করিতে না পারা যায় ততদিন সাধুর গন্তব্য পথে গমন করিবার জন্য বাসনা বেগ দমন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন সাধুর পথে যাইতে না পারিবে, ততদিন কিছুতেই ধর্ম্মপথ পাইবে না। মুখে হরি নাম করিলে, তিলক সেবা করিলে, ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—নানা বিদ্যা শিখিয়া তর্কে পণ্ডিত হইলে ধর্ম্মপথে যাওয়া যায় না—বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি পুঁথি ঘাটীয়া পথ অনুসন্ধান করিলে ধর্ম্মপথ পাওয়া যায় না। যতক্ষণ চিত্তের মলিনতা থাকে ততক্ষণ কেহ কখন ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে পারে না। চিত্ত মলিন থাকিলে ধর্ম্মে আদৌ শ্রদ্ধা জন্মে না। আর এই শ্রদ্ধা ব্যতীত ধর্ম্মপথে যাইবার চেষ্টাই হয় না। তুমি বৌদ্ধ হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, হিন্দু হও—তোমার ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন—ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে তোমার প্রথম সোপান—প্রথম কর্ত্তব্য—চিত্ত নির্ম্মল করা। চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল না করিতে পারিলে তাহাতে জ্ঞান সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। চিত্তকে নির্ম্মল করিতে না পারিলে তাহাতে ভক্তির অমৃত উৎস—অথবা ভক্তির চরম পরিণতি—প্রেমের অমিয় নদী প্রবাহিত হয় না। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারে না—কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না—কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারে না—কর্ম্ম ফলত্যাগ করিতে পারে না।

চিত্ত মালিন্যের প্রধান কারণ—অজ্ঞান—আত্মাভিমান। ইহা হইতেই মানুষ স্বার্থের গণ্ডী মধ্যে আসিয়া—বাসনা পরিচালিত হইয়া অধর্ম্ম পথে যায়। মানুষ যতই স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে—আত্মসম্প্রসারণ করিতে পারে ততই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। ততই সে কর্ত্তব্য পথে যাইতে সমর্থ হয়।

স্বার্থের পথ—প্রবৃত্তি পথ। স্বার্থ বশেই আমরা ইহকালে নিজ সুখ চেষ্টা করি, অথবা যদি পরকাল মানি তবে পরকালের সুখের জন্য চেষ্টা করি। স্বার্থ চালিত হইয়াই আমরা প্রবৃত্তির পথে গিয়া থাকি। অহঙ্কার হেতুই প্রধানতঃ আমরা স্বার্থচালিত হই। এই প্রবৃত্তির পথ অধর্ম্ম পথ। আর যাহা ধর্ম্ম পথ—পরার্থ চেষ্টার পথ, কর্ত্তব্য পথ, নিষ্কাম কর্ম্মপথ, ভক্তি পথ, জ্ঞান পথ—তাহা নিবৃত্তির পথ।

এই নিবৃত্তি পথে যাইতে হইলে বাসনাবেগ দমন করিতে হয়—চিত্ত নির্ম্মল করিতে হয়—নিরোধ শক্তির স্ফুর্ত্তি করিতে হয়। এই নিরোধ শক্তির স্ফুরণ হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মপথে যাইতে পারা যায়। এই নিরোধ শক্তির স্ফুরণ হইতেই—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যাসত্যমক্রোধ॥"

এই দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের স্ফুর্ত্তি হয়। অতএব যে পথে যাইলে এই নিরোধশক্তির স্ফুর্ত্তি হয়—উক্ত দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়—তাহাই প্রকৃত পথ।

জর্ম্মাণ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহর (Schopenheaur) তৎকৃত "World as Will & Idea" নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে মানুষের মধ্যে যাহা মনুষ্যত্ব যাহা (being in itself) মূলসত্ব তাহা এই ইচ্ছা শক্তিত্ব—মানুষ এই শক্তির কেন্দ্র মাত্র। মানুষ এই জন্য স্বভাবতঃই (assertion of the will) জন্য, বা প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়। কিন্তু মানুষের মোক্ষপথ বা ধর্ম্মপথ নিবৃত্তির পথ—(denial of the willএর পথ। সেই পথে যাইতে পারিলেই চিত্ত নির্ম্মল হয়, নিরোধ শক্তির বৃদ্ধি হয়, স্বার্থের পরিসর কমিয়া আসে—বাসনার প্রকোপ হ্রাস হয়। সেই পথে যাইলে তবে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। সেই পথই আমাদের শুভ পথ।

শাস্ত্র মতে শুভপথ ও অশুভপথ আমাদের এই দুই পথ আছে। ইহার মধ্যে প্রাক্তন সুসংস্কার বলে শুভ পথে যাইবার ইচ্ছা উদয় হইলে পুরুষকার চেষ্টায় সেই পথে যাইতে হয়। যোগবাশিষ্টে আছে—

"শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ।
পৌরুষেন প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥"

যোগভাষ্যে উক্ত হইয়াছে——

"চিত্তনদীনামো ভয়তোবাহিনী বহতি কল্যানায়। বহতি পাপায় চ। তত্র যা কৈবল্যপ্রাগ্ভারা বিবেকনিম্না, সা কল্যানবহা, যন্নত্ববিবেক নিম্না সংসার প্রাগ্ভারা সা পাপবহা, তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয় স্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে বিবেক-দর্শনাভ্যাসেন চ কল্যাণ স্রোত উদ্ঘাট্যতে ইতুভয়াধীন শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"

আমাদের চিত্ত নদী উভয় পথে বহিতে পারে—কল্যান পথে বা পাপ পথে। বিবেক বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা পাপ পথ রুদ্ধ করিয়া কল্যাণ পথ উদ্ঘাটন করিতে হয়।

আমরা স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি পথে বা পাপ পথে পরিচালিত হই। সেই পথ রুদ্ধ করিয়া আমাদের বিপরীত পথে যাইতে হইবে। নদীর উজান মুখে আমাদের যাইতে হইবে। আমাদের জীবন নদী স্বাভাবিক যে পথে প্রবাহিত হয়—সেই পথ উপযুক্তরূপে রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার বিপরীত পথে তাহাকে বহাইতে হইবে—উৰ্দ্ধ স্রোতস্বিনী বৃত্তির স্ফুরণ করিতে হইবে। মধুসূদন বলিয়াছেন—

"যথা তীব্রবেগোপেতং নদীপ্রবাহং। সেতু বন্ধনেন। নিবার্য্য কুল্যা প্রয়নেন। ক্ষেত্রাভিমুখং তির্য্যক্ প্রবাহান্তরমুৎপাদ্যতে। তথা বৈরাগ্যেন চিত্ত নদ্যা বিষয় প্রবাহং। নিবার্য্য সমাধ্যামেব প্রশান্ত বাহিতা। সংপাদ্যতে।"

অতএব আমাদের কোন পথে যাইতে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি—এই যে শুভপথ, কল্যানপথ বা কৈবল্য পথের কথা উক্ত হইয়াছে ইহাই আমাদের পথ। কিন্তু এ পথ দেখাইয়া দিবে কে? শাস্ত্র খুঁজিয়া এ পথ পাওয়া যায় না। বলিয়াছিত, শাস্ত্রে নানালোকের জন্য নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। পর্ব্বতের শিখর দেশে উঠিবার জন্য নানা পথ থাকে। কিন্তু সকল পথেরই গন্তব্য স্থান এক। আর কোন পথই না দেখাইয়া দিলে পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তি মার্গে চিত্ত শুদ্ধির জন্যই বেদাদি শাস্ত্রে নানা পথ আছে। সকল পথ ধরিয়াই নিবৃত্তি মার্গ পরিনামে লাভ হয়। সে দিন আমার কোন বিশিষ্ট বন্ধু বলিতেছিলেন যে তিনি কোন এক পর্ব্বতের

উপর উঠিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উপরে পথ দেখিতে পাইতেছিলেন কিন্তু তাহার নিম্নে এত জঙ্গল যে সে পথ কেমন করিয়া ধরিবেন তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এমন সময় একজন সামান্য রাখাল সেইখানে আসিল। তাহাকে তিনি পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অবলীলাক্রমে নিমেষ মধ্যে সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়া দেখাইয়া লইয়া গেল। আমার বন্ধু এই কথা বলিয়া বলিলেন যে সেই হইতে তিনি বুঝিয়াছেন যে ধর্ম্ম পথে যাইতে হইলে পথ দর্শকের প্রয়োজন; এবং ইহা হইতেই তিনি বুঝিয়াছেন যে গুরুর নিকট দীক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

তাই বলিয়াছি যে ধর্ম্ম পথে যাইতে হইলে পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন। শাস্ত্র হইতে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা সহজে ঠিক করা যায় না। আর ঠিক করিতে পারিলেও সে পথে যাইবার উপায় আমরা আপনা আপনি পাই না। সাধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ পাইলেই আমরা সহজে পথ পাইতে পারি। আর যদি একান্তই সাধুসঙ্গ না পাই তবে সাধু যে পথে গিয়াছেন সেই পথ ধরিতে পারিলেও পথ পাইতে পারি।

এইরূপে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারি "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। ইহার প্রকৃত অর্থ কি?

ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে সাধারণ লোককে মহাজন বা শ্রেষ্ঠের পথ যে অবলম্বন করিতে হয় ইহা গীতায় উল্লিখিত আছে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি:—

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাং সো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।

*   *   *

কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"

সংসারে নিজে চেষ্টা করিয়া ধর্ম্ম পথে যাইতে পারে এমত লোক অতি বিরল। তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ। তাঁহাদের কাহাকেও অনুসরণ করিতে হয় না। তাঁহারা নিজে যে আলোক পান সেই আলোকে সংসারকে আলোকিত করেন। তাঁহাদের পক্ষে অরণ্য পথ মহাজনের পথ নহে—কেননা তাঁহারা নিজেই মহাজন। অতএব মহাজন বা সাধু ব্যতীত অন্য সকলের সম্বন্ধেই বলা

যায় যে ধর্ম্মপথে তাহাদের সাধুকেই অনুসরণ করিতে হয়। তাঁহারা যদি আপনারা আপনাদের পরিচালিত করিতে যায় তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিপদগামী হয়।

ধর্ম্মপথে যাঁহারা মহাজন, তাঁহারা ধর্ম্মবীর। ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে পথে অনেক দস্যু আছে। সে পথে—

"লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ।
পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ।"

যে পথে আমাদের নিজ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। যে ইচ্ছা গতি বা বাসনা বীজে মানুষের জীবত্ব——সেই ইচ্ছা শক্তিকে নিস্তেজ করিতে হয়; assertion of the will এর পরিবর্ত্তে "Denial of the will" শিক্ষা করিতে হয়।

ক্ষীণবল আমরা সেই অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম সংগ্রামে, সেই আভ্যন্তরিক অসুরের সহিত দেব সংগ্রামে নিজে সক্ষম নহি। যাঁহারা ধর্ম্মবীর ধর্ম্মযুদ্ধের মহারথী তাঁহাদের অধিনেতৃত্বে সামান্য সেনানার ন্যায় পরিচালিত হইলে তবে সেই সংগ্রামে জয় করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে পারি।

তাই বলিতেছি যে ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে আমাদের "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অবলম্বন করিতে হয়। এই মহাজনেরাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধু, ধর্ম্মবীর। বৈষ্ণবগণ মহাজন অর্থে সাধুই বুঝেন। তাঁহাদের মহাজন পদাবলী অনেকেই জানেন।

অন্যদিকে ইংরাজী কথায় বলিলে মহাজনকে (Great man) বলা যায়। পণ্ডিত কার্লাইল ইহাদিগকে (Hero) বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মবীর (religious hero) তাঁহারা আমাদের অনুসরণীয়। পণ্ডিত কার্লাইলের উক্ত ধর্ম্মবীর বা মহাপুরুষগণকে ঈশ্বরের অবতার বলাও যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি যাঁহারা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ জন্য সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত বিনাশ জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন তাঁহারই এই মহাজন বা মহাপুরুষ।

তবে তাঁহারা নিত্য জগতে আবির্ভূত থাকেন না—যুগে যুগে অবতীর্ণ হন মাত্র। এজন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ দুর্লভ। হয়ত সঙ্গ পাইলেও আমরা তাঁহাদের

চিনিতে পারি না। এই জন্য বলিতে হইবে যে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া যে সকল সাধুদের রক্ষা করেন এবং যাঁহাদের রক্ষার দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, সেই সাধুদের অনুসৃত পথই ধর্ম্মপথ।

অতএব স্বধর্ম্মত্যাগ না করিয়া মহাপুরুষদের মধ্যে কাহারও প্রবর্ত্তিত পথে সাধুদের অনুসরণ করিয়া যাইতে পারিলেই ধর্ম্ম পথে যাওয়া যায়। তাহাই পথ। সাধুদের অনুসরণ ব্যতীত নিজ চেষ্টায় আমরা মহাপুরুষদের প্রবর্ত্তিত পথে যাইতে পারি না। শাস্ত্র বিহিত কোন পথে যাইতে পারি না। যতক্ষণ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই পথে যাইবার শক্তি আমরা না পাই ততক্ষণ আমরা সে পথ ধরিতে পারি না। সেই শক্তি পাইবার জন্য নিয়ত যে চেষ্টা যে বৈরাগ্য ও অভ্যাসের প্রয়োজন তাহা সাধু সঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়। সর্ব্বদা সাধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিলে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ধর্ম্মপথে যাইবার শক্তি আমরা সঞ্চয় করিতে পারি। যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই পথে যাইতে হয়, সাধুসঙ্গ ও অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম তাহার প্রথম দ্বার—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মধুসূদন গীতা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গমাধ্যাত্ম বিদ্যাধিগমৌত্বভ্যাস
বৈরাগ্যোপপাদকতয়া ন্যায়সিদ্ধৌ তয়োরেবান্তর্ভবতঃ॥

ত্যই বলিতেছি ধর্ম্মপথে যাইতে হইলে শুভপথে যাইতে হইলে আমাদের সাধু ধর্ম্মবীরদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।

সাধু কাহারা ? যাহারা সন্মার্গগামী তাঁহারাই সাধু (গীতার ৪। ৮ শ্লোকের শাঙ্করভাষ্য) যাঁহারা স্বধর্ম্মবর্ত্তী (স্বামী) তাঁহারাই সাধু। যিনি সাধু তিনি সর্ব্বদা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, ধৃতিক্ষমাদি নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মযুক্ত। তিনি ফকির হউন, আমীর হউন, গৃহী হউন, সন্ন্যাসী হউন, তিনি প্রতিমা পূজক হউন, আর একেশ্বরে ভক্তিমান হউন তিনি সর্ব্বথাই সন্মার্গগামী।

"সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি (ঈশ্বরে)
বর্ত্ততে।" (গীতা)।

তিনি হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খ্রীষ্টান হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন,—তিনিই প্রকৃত সাধুর ন্যায় সর্ব্বথাই আচরণ করেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ লেখা পড়া জানিতেন না বটে—কিন্তু তাঁহার মত সাধু মহাপুরুষ কয়জন পাওয়া যায় ?

(তাহাকেই পণ্ডিত মোক্ষমূলর Great Mahatma বলিয়াছেন) কেবল অঙ্গে ছাপ দিয়া নামাবলী গায় দিলে অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া গেরুয়া পরিয়া করঙ্গ হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে সাধু হয় না। নিজে চিত্তসংযম না শিখিয়া শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও সাধু হওয়া যায় না।

যিনি প্রকৃত সাধু তাঁহারই পথ অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারই অনুসরণ করিতে হয়। তাঁহাদের মতামত জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাঁহারই জীবন আদর্শ কয়িয়া আমাদের নিজের ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হয়। যাঁহারা সাধু তাঁহারাই ধর্ম্মবীর তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই ধর্ম্ম পথের মহাজন তাঁহারাই Greatmen।

"Lives of greatmen all remind us
We can make our lives sublime,
And departing leave behind us
Footprints in the sands of time."

এই ধর্ম্মপথের মহাজনদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই পথ। অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ভক্তি ও ভক্ত চরিত।

"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা"—
নারদ ভক্তি সূত্র।
"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—শাণ্ডিল্য সূত্র।

ভগবানের প্রতি পরম প্রেমভাবই প্রকৃত ভক্তি। ভক্ত ভূত বা ভবিষ্যৎ ইষ্ট প্রাপ্তিতে অভিলাষ শূন্য, পুত্র, ধন বা যশের প্রার্থনা শূন্য—কেবল মাত্র প্রাণের আবেগেই ভগবানে আত্ম সমর্পণ করে। প্রকৃত ভক্ত মুক্তিরও প্রার্থী

নহেন। তাঁহার প্রাণ আপনা হইতেই ভগবানের শ্রীচরণের জন্য ব্যাকুল। ভগবান কি বলিতেছেন শুনুন—

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ॥

আমাতে যিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—তিনি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌম পদ, কি পাতালের আধিপত্য কি যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও চাহেন না। আমি ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভক্তির আবশ্যকতা বা উপকারিত্ব কি? তদুত্তরে দুইটী কথা প্রধানতঃ বলা যায়। প্রথম, ইহলোকে মনুষ্য সমাজে ভক্তি সাহায্যে জীবের উৎকৃষ্ট বৃত্তি গুলি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মানবকে প্রীতিকর ও উন্নত করিয়া তুলে। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিয়া মানবকে শ্রীভগবানের সঙ্গ প্রাপ্তির অধিকারী করে। বালক, বৃদ্ধ ও বণিতা, ধনবান ও দরিদ্র, ভদ্র ও ইতর সকলেই ভক্তির অধিকারী। সরল অন্তঃকরণে, কাতর প্রাণে ডাকিতে পারিলেই ভগবৎ কৃপায় ভক্তিলাভ করিতে পারা যায়। তবে প্রকৃতি বিশেষে ভক্তি উপার্জ্জনের প্রণালীর ইতর বিশেষত্ব দেখা যায়। যাঁহার হৃদয় কোমল, যিনি প্রেমিক বা যাঁহার প্রকৃতি ভাব প্রধান (Emotional,) তাঁহার পক্ষে ভক্তি সহজ লভ্য ও তিনি ভক্তিমার্গে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিতে ও পারদর্শী হইতে পারেন। বিশেষ শিক্ষা না করিয়াও কেবল মাত্র অনুরাগেই শ্রীভগবানকে কিনিতে পারা যায়। শ্রীভগবান মোহান্ধ দীন হীন মানবের জন্য, ভক্তের কারণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থে এ ভাবটী পরিষ্কার করিয়া দেখিইয়াছেন ;—

"কদম্ব কাননে,　　বসিয়া নির্জ্জনে,
　　বাম করে মুখ রাখি।
নয়ন ঝুরিছে,　　বদন ভাসিছে,
　　অরুণ বরণ আঁখি॥

*　　*　　*

ব্যাকুল হইয়ে,　　শিরে হাত দিয়ে,
　　কহি, "শুন চন্দ্রমুখ!

হে প্রাণবল্লভ, এ কি অসম্ভব,
তোমার কিসের দুখ!
তাপিত হইলে, তোমারে ডাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়।
দুঃখের সাগরে, ডাকিলে কাতরে,
আনন্দে ভাষাও তায়॥"

* * *

বলে প্রাণ নাথ, "শুন প্রাণ প্রিয়ে,"
মলিন মুখেতে হাসি।
বঁধুর বদন, বোধ হল যেন,
কুয়া ঢাকা পূর্ণ শশী॥

* * *

"এই জগ মাঝে, দয়াবান আছে,
অন্য লাগি প্রাণ দেয়।
আমি দিনুদয়া, তবে সে পেয়েছে,
অকারণে ভজি তায়॥
মোর জনে আছে, আমার তা' নাই,
এমন হইতে নারে।
মোর জন হতে, যদি ছোট হই,
কি বলিবে প্রিয়া মোরে?
ভক্তে বাসি ভাল, নানা গুণ দিল,
এবে মন্দ হতে নারি।
যদি মন্দ হই, মর্ম্মাহত হয়ে,
ভক্তগণ যাবে মরি॥"

* * *

"দিবানিশি কান্দ মোর লাগি।
দেখি তোর আঁখি বারি, স্থির থাকিবারে নারি,
কান্দি হই তোর দুঃখভাগী॥"

* * *

"প্রিয়া দুঃখে কান্দে, মোর কান্দে হিয়া।
পরাণ জুড়াই নিভৃতে কান্দিয়া॥" *

ভগবান বিরলে বসিয়া ভক্তের দুঃখে কাতর, তাঁহার অনুরক্তিতে বিহ্বল—এ·ভাব স্বঃতই ভক্তি প্রবর্ত্তক। পরন্তু, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব মনে হইলে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বিরাটরূপ মাত্র এইরূপ চিন্তা করিলেও, শ্রীভগবানে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভক্তি পথের সহায়রূপে শ্রীচৈতন্যোক্ত পঞ্চসাধন এই—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ফলতঃ, ভজন ও সাধন, ভগবদ্ আলোচনা ও সাধু সঙ্গ বা সৎসঙ্গ ভক্তি-পথের বিশেষ সহায়। সাধুসঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটী মহাজন বাক্য এই স্থলে উদ্ধৃত করিব—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

অপিচ—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদার্শ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভাগবত।

সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তি সম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইতে থাকে। সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই সাধুসঙ্গ ভোগাভিলাষে ভক্ত শ্রীমন্নাভাজী গ্রথিত ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে কতকগুলি ভক্ত চরিত পাঠককে উপহার দিব। আশাকরি ভগবদ্ কৃপায় ভক্তচরিত পাঠে পাঠক ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

* শ্রীকালাচাঁদ গীতা, পঞ্চম সখীর কাহিনী, ১৬৪-৮৪।

অদ্য গ্রন্থকার নাভাজীর কিছু পরিচয় দিব। নাভাজী স্বয়ং একজন ভক্তচূড়ামণি।

—::—

শ্রীমৎ নাভাজীউ চরিত।

শ্রীমৎ নাভাজী হনুমানের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মান্ধ ও জন্ম দুঃখী ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় নাভাজীর মাতা নাভাজীকে ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া এবং অনন্যোপায় দেখিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া যান। একে শিশু তাহার উপর অন্ধ—অনাথ নাভাজী সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বনে কাতর হইয়া বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, এমন সময় কিলজীব ও অগরদাস নামে দুই জন সাধু সেই স্থানে ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হন। হতভাগ্য নাভাজীর দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় দয়াদ্র হইল। এবং কমণ্ডলু হইতে পুণ্য সলিল নাভাজীর চক্ষে ছিটা দিলেন। নাভাজীর এতক্ষণে দুই চক্ষু প্রকাশ হইল। বুদ্ধিমান, ধীর ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত নাভাজী উভয়ের চরণে পতিত হইয়া উভয়ের চরণ চক্ষুজলে ধৌত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কিলজীবের আজ্ঞায় অগরদাস নাভাজীকে তাঁহার সেবক করিয়া লইলেন। বৈষ্ণব অগরদাসের পদসেবা ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতে নাভাজী অগরদাসের কৃপাভাজন হইয়া উঠিলেন। সাধুকৃপায় নাভাজীর হৃদয়ে অপার ভক্তি উথলিয়া উঠিল। এক-দিন অগরদাস অন্তর্মনা হইয়া ধ্যানাবিষ্ট আছেন, নাভাজী পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া মন্দ মন্দ বীজন করিতেছেন। এমন সময় শ্রীমৎ অগরদাসের এক প্রিয় শিষ্য দুঃখে পতিত হইয়া কাতরান্তঃকরণে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে গুরু অগ্রদাসকে স্মরণ করিলেন। শিষ্য বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার জাহাজ চড়ায় লাগিয়াছিল ধ্যানস্থ অগরদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন। শিষ্যের দুরবস্থা স্মরণ করিবামাত্র জাহাজ চড়া ছাড়িয়া চলিতে লাগিল। সেবক নাভাজী পশ্চাতে থাকিয়া এ সকল তথ্যই বুঝিতে পারিলেন। এবং মৃদুস্বরে শিষ্যের উদ্দেশে বলিলেন—"জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজপুরে।" নিভৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে সে ক্ষীণ-স্বর গুরুর কর্ণে প্রবেশ

করিল। অগরদাস চক্ষু উন্মিলন করিলেন—দেখিলেন পশ্চাতে নাভাজী। বৈষ্ণব সেবায় নাভাজীর শক্তি প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন—

"অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন।
যতনপূর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন॥" *

গুরুর আজ্ঞা শুনিয়া যোড়হস্তে নাভাজী বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, ভক্তিরীত জানিব কেমতে"। সূক্ষ্মদর্শী অগরদাস ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সাগর নায়ের কথা জানিলে যেমতে।" সেই অন্তর্দৃষ্টির বলে দেশ ও কালের (time and space) বাধা অতিক্রম করিয়া নাভাজী বৈষ্ণবমঙ্গলভক্তমাল গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

পৌরাণিক কথা।

——(++:০:++)——

পুরাণের বিষয়।

পুরাণ কল্পের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসে ১০টি বিষয় বর্ণিত হয়। এই জন্য পুরাণকে দশ লক্ষণ বলে। ঐ দশটি বিষয়ের নাম সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়। (ভাগবত পুরাণ ২—১০)

১। সর্গ অর্থাৎ উপাদান সৃষ্টি। পাঁচ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ), পাঁচ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ), পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন, অহঙ্কার এবং মহৎ—এই সকল ত্রিলোকী এবং ত্রিলোকীস্থ জীব সমূহের প্রাকৃতিক উপাদান। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই মূলপ্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে। গুণের বিষমতা প্রযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে উপরিলিখিত ২৩টি তত্ত্বের

* শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থঃ, শ্রী কৃষ্ণদাস বাবাজীর দ্বারা সংগৃহীত।

আবির্ভাব হয়। মূলপ্রকৃতির সহিত এই ২৩ তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনের ২৪ তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়। সমগ্র তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম "সর্গ"।

২। বিসর্গ অর্থাৎ চরাচর জীব সৃষ্টি। তত্ত্বের আবির্ভাব হইলে, ব্রহ্মা ঐ তত্ত্বের সংহতি দ্বারা চরাচর জীব সমূহকে পূর্ব্ব কল্পের বীজ অনুসরণ করিয়া ব্যক্ত করেন। ইহাকে "বিসর্গ" বলে।

৩। স্থান। সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম "স্থান", কিম্বা "স্থিতি"। শ্রীধর স্বামীর কথাগুলি ব্যবহার করা গেল।

৪। পোষণ। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। মন্বন্তর। মন্বন্তরের বর্ণন এবং মন্বন্তরাধিপতিগণের ধর্ম্ম কথন।

৬। উতি অর্থাৎ কর্ম্ম বাসনা। ফল কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বাসনার সঞ্চার হয়। ঐ বাসনা দ্বারা ত্রিলোকীর সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ হয়। যতদিন কর্ম্ম বাসনা থাকে ততদিন ত্রিলোকীর সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

৭। ঈশানু কথা। ভগবানের অবতার বর্ণন এবং ভগবানের অনুবর্ত্তী ভক্তদিগের কথা।

৮। নিরোধ। জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের সকল শক্তি ও উপাধি লইয়া শয়ন অর্থাৎ প্রলয়।

৯। মুক্তি। অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম জীবের মুক্তি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্য, আমার দেহ, এইরূপ বদ্ধ ভাবের পরিত্যাগ এবং আমি বন্ধ রহিত চৈতন্য মাত্র এই ভাবে স্থিতির নাম মুক্তি।

১০। আশ্রয়। যাহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা শব্দে অভিহিত তিনিই "আশ্রয়"।

এই দশটি বিষয় অনুশীলন করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।

১। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই পরিণামী লোকসমূহের অবিকারী, অপরিণামী আশ্রয় (Substratum) আছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্যাপক। ঐ আশ্রয় ব্যাপক (All pervading)। আত্মা চৈতন্য রূপ। ঐ আশ্রয় পরম আত্মা অর্থাৎ সকল পদার্থেরই আত্মা এবং সমগ্র পদার্থের আত্মা। এই জন্য সকল পদার্থেই চৈতন্য আছে। ঐ আশ্রয়কে Herbert Spencer সাহেবের মতে the Absolute বলা চলে।

২। ঐ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াই নানারূপ লীলা খেলা হয়। কল্পের মধ্যে যে লীলা খেলা হয়, তাহাই কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সকলই নিয়মের অধীন। সেই সকল নিয়ম পরে দেখা যাইবে।

৩। সৃষ্টি বলিলে আদি সৃষ্টি বুঝিতে হইবে না। যেমন নানাজাতীয় তৃণ পূর্ণ বসুন্ধরা সূর্য্যের খরতর কিরণে দগ্ধ তৃণ হইয়া ক্ষেত্র মাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে বিনষ্ট তৃণসকলের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং বর্ষার পুনরাগমে পূর্ব্ব জাতীয় তৃণ সকলের উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং সৃষ্টির পুনরারম্ভে পূর্ব্ব সৃষ্টির পুনরুদ্ভব হয়।

যেরূপ বর্ষার জলে প্রথমে ভূমির বিকার হয়, এবং তৃণাদির আহারোপযোগী নানারূপ রসের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তৃণাদির অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ কল্পমধ্যে প্রথমে "সর্গ", তাহার পর "বিসর্গ" হয়।

৪। প্রলয় বলিলেও সেইরূপ অত্যন্ত নাশ বুঝিতে হইবে না। প্রলয় অপেক্ষা নিরোধ কথা সত্যের অধিকতর ব্যঞ্জক। কিন্তু নিরোধ কথার একটি নিগূঢ় ভাব আছে, যাহা সাধারণে ধারণা করেনা। চেতন জীব কিম্বা চেতন ঈশ্বরের শয়নকে নিরোধ বলে। "নিরোধোঽস্যানুশয়ন যশত্মনঃ সহ শক্তি ভিঃ" ভা, পু, ২—১০—৬।

আমরা প্রতিদিন শয়ন করি। সেই সময় আমাদের দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্ট থাকে। আমাদের শক্তি সকল কতক নিশ্চেষ্ট থাকে, কতক কার্য্য করে।

প্রতিদিনের শয়ন অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। শরীর নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু নষ্ট হয় না।

মৃত্যুও একরূপ শয়ন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপি। এই শয়নে দেহ রূপ প্রকৃতির নাশ হয়। এবং অন্যান্য সুক্ষ্ম প্রকৃতি (মন ইত্যাদি) সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া জীবের ক্ষেত্রে নিহিত হয়। ঐ ক্ষেত্রকে "কারণ শরীর" বলে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র মূল প্রকৃতি, সেইরূপ জীবদেহের ক্ষেত্র কারণ শরীর।

মনুষ্য প্রতিদিন শয়ন করিলে শরীর কেবল মাত্র নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু শরীরের সহিত একবারে বিচ্ছেদ হয় না। কারণ অল্পকাল পরেই আবার

শরীরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্যুর সুদীর্ঘ শয়নে শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও শরীরের নাশ হয়।

শরীরস্থ ধাতুসমূহের একত্র অবস্থান এবং শরীরের জীবন শক্তি চেতন জীবের সংযোগ সাপেক্ষ। শরীরের লয় কিছু স্বতন্ত্র নহে। জীবের শয়ন জনিত শরীরের সহিত যে বিচ্ছেদ তাহাই শরীরের লয়।

শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ ও জীব শব্দে অভিহিত হয়। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানীকে ঈশ্বর বলা যায়। জীব মৃত্যুরূপ শয়নে শয়ান হইলে যেরূপ দেহের নাশ হয়, ঈশ্বর প্রলয় কালে শয়ন করিলে সেইরূপ তাঁহার ত্রিলোকী দেহের নাশ হয়।

দেহ পরিবর্ত্তনের সহিত আমার নাম কখনও রাম, কখনও শ্যাম। সেইরূপ প্রতি ত্রিলোকীর ব্রহ্মা ভিন্ন। কল্পের নামভেদে, ব্রহ্মার নাম নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন বরাহ কল্পের ব্রহ্মা, পাদ্ম কল্পের ব্রহ্মা। আমার কখন ও রাম, কখনও শ্যাম দেহ হইলেও যেমন আমি একই পুরুষ, সেইরূপ নানা ত্রিলোকী ময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একই পুরুষ।

"পুরুষ" শব্দের অর্থ যে পুর মধ্যে শয়ন করে। যে আমর দেহ পুরের মধ্যে শয়ন করে, সে আমার দেহের পুরুষ। যে ব্রহ্মাণ্ড পুরের মধ্যে শয়ন করে, সে ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ। সেই ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ শয়ন করিলেই, ত্রিলোকীর প্রলয় হয়। বাস্তবিক সে প্রলয়, পুরুষের শক্তির নিরোধ। পুরুষের শক্তি ত্রিলোকী হইতে সমাহৃত হইলেই, ত্রিলোকী খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়।

এই পুরুষের জ্ঞানই পুরাণের মূল শিক্ষা। পুরুষের জাগরণই সৃষ্টি, পুরুষের শয়নই লয়।

৫। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, দেবের দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—ইহাকেই মর্য্যাদা বলে। প্রথমতঃ এই মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, জীব এক অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারে না। এক অবস্থায় অবস্থিত না হইলে, জীব দৃঢ় সংস্কার লাভ করিতে পারে না। দৃঢ় সংস্কার লাভ না করিলে জীব অবস্থার উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব এইরূপ ভাবে জীবের পালন করিতে হয়, যে সে আপন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

এই জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম "স্থান"।

সত্বগুণের দ্বারা এই উৎকর্ষ বিধান হয়। ইহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

৬। যে সকল জীব সত্বগুণ দ্বারা আপনার উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ভগবানের সেবায় আত্ম সমর্পন করেন, তাঁহারা ভক্ত। বিষ্ণুরূপী ভগবান্ বিশ্বের পালক। অতএব ভক্ত মাত্রেই বিশ্ব পালনে ভগবানের সহকারী হয়েন। ভগবান্ সেই ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। ইহারই নাম পোষন।

৭। কালভেদে কল্পের তিনরূপ ধর্ম্ম বিভাগ। যেমন শিশু যতদিন পূর্ণবয়স্ক না হয় ততদিন নিত্য নূতন বোধের সংগ্রহ করে, তাহার পর পূর্ণবয়স্ক হইলে অজ্ঞানময় বোধ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় বোধ অবলম্বন করে, রে জরার আক্রমণে শিথিলেন্দ্রিয় ও শিথিলচেষ্ট হইয়া কালের কবলে পতিত হয়, সেইরূপ কল্পের আরম্ভে জীব ভাব ও বোধের নানাত্ব গ্রহণ করে, পরে উত্তম ভাবে ও উত্তম বোধে অবস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রলয়াগমে নিরুদ্ধশক্তি ও নিরুদ্ধচেষ্ট হয়। এই তিন ভাগকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বলে। এই তিন মূলধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মন্বন্তরের ধর্ম্মভেদ হয়। কল্পের প্রথম ভাগ সৃষ্টি ধর্ম্ম প্রবল, মধ্যম ভাগ স্থিতি ধর্ম্ম প্রবল, ও শেষ ভাগ লয় ধর্ম্ম প্রবল। মন্বন্তর বর্ণনে ইহা বিশদীকৃত হইরাছে।

৮। কর্ম্মবাসনা দ্বারা পরম্পর সম্বন্ধ হইয়া জীব সংসারের স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কর্ম্মবাসনাই সংসারের মুল।

৯। জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন এবং ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। অবতার ও ভক্তগণের চরিত্র বর্ণন পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। অবতারের বিচার পরে করা হইবে।

১০। জীবের আমিত্ব সংস্কারই বন্ধ। এত দেহ ধারণ করিতেছি, তথাপি প্রতি দেহেই আমি, আমি জ্ঞান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। দেহে আমিত্ব জ্ঞান

তিরোহিত হইলে, দেহাবচ্ছিন্ন মনে ও আমিত্বজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন সেই মন "আমিত্ব" অর্থাৎ অহঙ্কারের সীমা অতিক্রমন করিয়া, মহৎ তত্ত্বের অবলম্বন করে। তখন বিশ্বজ্ঞান স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয় এবং জীব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। মহত্তত্ত্বের অবলম্বনে জীব ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করে। সে ঈশ্বরের সহিত এক লোকে অবস্থিত হয় (সালোক্য), তাহার ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য হয় (সার্ষ্টি), সে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয় (সামীপ্য), ঈশ্বরের সমান তাহার রূপ হয় (সারূপ্য), এমন কি ঈশ্বরের সহিত সে একত্ব লাভ করে (সাযুজ্য)। কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি এই সকল মুক্তিকে হেয় জ্ঞান করেন। ভগবানের সেবাই ভক্তের পরম লাভ। তাঁহারা ভগবৎসেবা ও ভগবৎ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু জানেন না। ভগবানের কর্ম্ম বিশ্বপালন। বিশ্বপালনে সহকারিত্বই ভগবৎসেবা।

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈ কত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লান্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

ভাঃ-পু-৩-২৯-১৩০।

পুরাণের এই সকল বিষয়। আর্য্যদিগের এই ইতিহাস। যাঁহারা এই *ইতিহাস লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে এবং* অত্যল্প মাত্র কাল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

দশ-অবতার।

জল-গর্ভে নিমগন বসুধা ছিল যখন,
দেখালেন 'মৎস্য'-রূপে হরি সে যুগ ভীষণ। ১
উভচর 'কূর্ম্ম'-রূপে করি কূলে আরোহন,
দেখালেন যুগান্তর—জলে স্থল নিদর্শন। ২
ধরিয়া 'বরাহ'-রূপ মহামূর্ত্তি নারায়ণ,
প্রকাণ্ড মৃণ্ময় ধরা করিলেন উত্তোলন। ৩

মৃগেন্দ্র 'নৃসিংহ'-রূপে সহ বন্য প্রাণীগণ,
বিচরি প্রান্তর-ক্ষেত্রে করেন বনে ভ্রমণ । ৪
করি খর্ব্ব-নরাকার 'বামন'-রূপ ধারণ,
স্থাপেন প্রভুত্ব ব্যাপি বারিধি-ধরা-গগন । ৫
অবতরি 'রাম'-রূপে কুঠার করি ধারণ,
প্রকাশেন কত দেশ ছেদিয়া গহন বন । ৬
ধনু করে 'রাম'-রূপে রক্ষঃ সহ করি রণ,
নর-সত্ত্ব-অধিকার করিলেন সংরক্ষণ । ৭
হল ধরি 'রাম'-রূপে করিয়া ভূমি কর্ষণ,
শিখালেন জীবে কর্ম্ম করিতে জীবিকার্জ্জন । ৮
পরে 'বুদ্ধ'-অবতার ধর্ম্ম সংস্কার কারণ,
নব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপেন খ্যাত ভুবন । ৯
'কল্কি'-রূপে করিবেন শ্বেত-অশ্বে আরোহন,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-চরাচরে বিপ্লব হবে তখন । ১০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র ।

——:০:—:০:——

মৃত্যু-রহস্য ।

(দ্বিতীয় সংখ্যার ৬২ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

আমিও চিন্তাযুক্ত হইলাম। মুরারী বাবুর শেষ কথাগুলি আমার কর্ণে বাজিতেছিল—কন্যার পূর্ব্বরাগ বুঝিয়া তিনি কার্য্য করিবেন শুনিয়া আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে পূর্ব্বরাগ আমার সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু তথাপি লাবণ্যের সহিত এ বিষয়ে কখনও স্পষ্টতঃ আমার বাক্যালাপ হয় নাই। একবার যেন কথা কহা আবশ্যক বোধ হইল। মাষ্টার মহাশয়ও আমাকে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেমন করে তাহা হয়? আমার বড় বিষম লজ্জা! আমি বড় ভাবনায় পড়িলাম।

কিন্তু ঘটনাচক্রের এমনি সমাধান, পথ আপনিই উন্মুক্ত হইল। বৈকালে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র আসিল। পত্রের মর্ম্ম—নিমন্ত্রণ, তাঁহার ইচ্ছা পরীক্ষাবসানে আমাকে চট্টগ্রামে লইয়া যান। এই উদ্দেশ্যে যথা সময়ে একজন লোক আমার নিকটে পাঠাইবেন তাহাও প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

একে পূর্ব্বেই সহস্র চিন্তায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, এক্ষণে এই পত্র প্রাপ্তিতে তাহা দ্বিগুণতর মথিত হইতে লাগিল। আমার সমুদয় পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল, একে একে জননার মৃত্যু, শ্বশুর মহাশয়ের অসদ্ব্যবহার, সুকুমারী প্রভৃতি সকল কথাই মনোমধ্যে উদিত হইল। আমার চিত্ত বিকল হইল।

এক্ষণে একটী বিচিত্র ঘটনা ঘটিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমি এইরূপ ঘোরতর চিন্তাবিষ্ট চিত্তে এই সময় একবার নীচের তলায় আসিলাম। কেন আসিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আসিয়া দেখি, অনন্ত ঠাকুরের কাছে দুইজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রবীন, অপরটী প্রৌঢ়। অনন্ত ঠাকুরের বোধ হয় নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। সে আমার পাচক ব্রাহ্মণ। তাহার সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক—এই লোকটী স্বভাবতঃ ধর্ম্মচর্য্যাশীল ছিল, আর তাহার সন্ন্যাসী ফকির ধরা কেমন একটা বাই ছিল। সম্প্রতি গঙ্গাসাগরের মেলা ভাঙ্গিয়াছিল, অনেক সন্ন্যাসী এই সময় কলিকাতার পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন, অনন্ত প্রায় প্রত্যহই তাঁহাদের দুই একজনকে উপস্থিত করিত। অতএব আজিকার সন্ন্যাসীদ্বয় দেখিয়া প্রথমতঃ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার মনে হয় নাই। কিন্তু একটু নিকটবর্ত্তী হইলে প্রবীনের আকার প্রকার দেখিয়া সহসা আমার কেমন একটা ভক্তি হইল। আমার বেশ সুস্পষ্ট ধারনা হইল সে মূর্ত্তি সাধারণ ভেকধারীর সম্ভবে না। ধর্ম্মের জ্যোতিঃ যেন তাঁহার সমস্ত অবয়ব প্রদীপ্ত করিয়াছিল, চক্ষু হইতে কেমন একটা প্রেমপূর্ণ কোমল অথচ প্রখর কিরণ বাহির হইতেছিল, আমি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আর রহস্য এই, যেন সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার পরিচিত বোধ হইল।

অনন্তকে এই সন্ন্যাসী-সেবার জন্য আমি কত তিরস্কার করিয়াছি, কতবার তাহাদের ভণ্ড প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়াছি, কিন্তু আজি আমার ভাবান্তর হইল। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইঁহাদের প্রণাম করিলাম।

প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার পানে কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পরে আমায় চিন্তাবিষ্ট লক্ষ্য করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় অযাচিত যাহা বলিলেন তাহার ধর্ম্ম এই—

"বৎস, চিন্তা ত করিলে অনেক, স্থির করিলে কি? বলি শুন, তোমার আশু বিপদ, যাঁহাদের তুমি তোমার অহিতকারী মনে করিতেছ, তাঁহাদের পরম মিত্র জ্ঞান করিবে। তাঁহাদের সহিত বিচ্ছেদ কল্পনা করা ভাল নয়। আর সম্প্রতি প্রতারক ষড়যন্ত্রীদের হস্ত হইতে যত শীঘ্র পার আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে।"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত আমার পরিচিত বোধ হইল। ব্যাপার কি? ইঁহাকে জানিবার ত কোনও সম্ভাবনা ছিল না, কোথাও যে দেখিয়াছি এমন ত কিছুই মনে করিতে পারিলাম না। যাহা হউক তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। আমার কোন প্রশ্ন করিতেই সাহস হইল না। এমন সময় সহসা আমার শ্বশুর মহাশয়ের পত্রের উপর সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়িল। পত্র খামে মোড়া আমার হস্তে ছিল, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন——

"হাঁ—এই পত্রলেখক যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পালন করিলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। তোমার পক্ষে তাহা করাই মঙ্গল।"

এবার আমার সন্দেহ হইল। এরূপ আলগা ভাবে কথা অনেক সময় ঠিক্ লাগিয়া যায়। সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিতে আমার বাসনা হইল। কিন্তু আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বে তিনি আপনি বলিলেন—

"বাপু; তোমার এ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল, ইহাদের সহিত সম্বন্ধও তোমার পূর্ব্ব জন্ম কৃত। আমার কথায় এক্ষণে তোমার প্রত্যয় হইলে যে বিধিলিপি খণ্ডিত হইবে তাহাও কি আর হয়? যাহা হউক আর একবার তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। সময়ে তোমার দৃষ্টি খুলিবার আর একবার চেষ্টা করিব তাহার পর ভবিতব্য যাহা তাহা ঘটিবে। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হওয়াও ত প্রাক্তন।"

সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিলেন। আমার সন্দেহ মিটিল না। আমি ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "এ পত্রের লেখক কে আপনি জানেন?"

সন্ন্যাসী আমার মুখের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—"তোমার শ্বশুর, অম্বিকা বাবু।"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল—"পরীক্ষা করিয়া ধৃষ্টতা কেন কর বাপু।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। নামই বা পাইলেন কোথায়, সম্বন্ধই বা জানিলেন কেমন করিয়া! আজিকার পত্রের বিষয়ও কেহই অবগত ছিল না। ডাকে পত্র আসিয়াছিল, ডাক হরকরা স্বহস্তে আমাকে সেই পত্র দিয়া গিয়াছিল তখন সে স্থানে কেহই উপস্থিত ছিল না। পত্র ইংরাজীতে লেখা, অনন্ত ইংরাজীর বর্ণমালাও জানিত না।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম, কিন্তু আমি দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীদ্বয় আমার বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা বড় গোলে পড়িলাম, "প্রতারক ষড়যন্ত্রী" কাহারা? অনেক চেষ্টা করিয়াও আর সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইলাম না।

আমি উপরে যাইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। চিন্তায় আমি আত্মহারা হইলাম।

* * * *

(ক্রমশঃ)

শ্রীভঃ—

—:০:—

অলৌকিক ঘটনাবলী।

(৩)

খৃঃ ১৮৮৫ অব্দে রাণাঘাটের বিখ্যাত পাল-চৌধুরী মহাশয়দিগের বংশীয় বিলাত প্রত্যাগত কোন ভদ্রলোক কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব্বাংশে ও জলের কলের নিজ দক্ষিণাংশে যে বৃহৎ অট্টালিকা আছে তথায় বাস করিতেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র অকস্মাৎ কলেরা রোগাক্রান্ত হওয়ায় সহরের খ্যাতনামা ইংরাজ ও বাঙ্গালী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয়েন। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রায় চরমসীমায় উপনীত হয়। তজ্জন্য একজন শুশ্রূষাকারী ভদ্রলোক সমস্ত রাত্রি তত্ত্বাবধান করিতে নিযুক্ত হয়েন এবং চিকিৎসকগণও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ব্যবস্থা ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। ক্রমশঃ রাত্রি দুই প্রহর অতিবাহিত হওয়ায় চিকিৎসকগণ শুশ্রূষাকারীকে যথারীতি উপদিষ্ট করিয়া বিদায় হইলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে চবস্ নির্ম্মিত কুলুপ লাগান হয় এবং তাহার চাবি শুশ্রূষাকারীর নিকট অর্পিত হয়। রোগ সাংঘাতিক হইতেছে দেখিয়া রোগীর মাতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে "হত্যা" দিবার মানসে একটী ঘরে দ্বারবদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। এবং সঙ্কল্প করিলেন যে পুত্রের অমঙ্গল হইলে আর

দ্বার না খুলিয়া অনশন ও অনিদ্রায় প্রাণত্যাগ করিবেন। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় রোগী মুমূর্ষু হইয়া পড়িল ও শিবনেত্র এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইল। শুশ্রূষাকারী সমস্ত রাত্রি উদ্বেগে কাটাইয়া এবং উপদেশমত ঔষধাদি সেবন করাইয়া সেই সময় তামাকু সেবন করিবার অভিপ্রায়ে বাহিরের বারেন্দায় আসিয়া ধুমপান করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম বুঝি বিফল হইল। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে এইরূপচিন্তা করিতেছেন এমন সময় সহসা দেখিতে পাইলেন যে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যষ্টির উপর ভর দিয়া তাঁহার সন্মুখে আসিয়া রোগীর নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি কোন্ ঘরে আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহাকে একবার দেখিবার মানস প্রকাশ করিলেন। শুশ্রূষাকারী এই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কারণ সদর দরজা যেমন বদ্ধ সেইরূপই রহিয়াছে অথচ বৃদ্ধটি বাটীর অভ্যন্তরে কি প্রকারে আসিলেন তাহা তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, যেহেতু সে বাটীর আর অন্য কোন প্রবেশ দ্বার ছিল না। যাহা হউক ব্যাপার কতদূর দাঁড়ায় দেখিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে রোগীর গৃহে লইয়া গেলেন ও দেখিলেন রোগী তখন গতাসুপ্রায় হইয়াছেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ রোগীর নিকট গিয়া তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "ওহে বাপু তুমি কেন ও রূপ করিয়া শয়ন করিয়া আছ? তোমার মা কাঁদিতেছেন আর তুমি শয়ন করিয়া আছ? উঠ! উঠ!!" তদনন্তর শুশ্রূষাকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "বাপু তুমি রোগীর পশ্চাতে গোটাকত তাকিয়া দেও ও উহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেও কোন ভয় নাই।" যদিও চিকিৎসকগণ উঠিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি শুশ্রূষাকারী প্রাচীনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। রোগীকে যে রূপে বসাইতে বলিলেন সেইরূপ করিলেন। তখন প্রাচীন লোকটী নিকটস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া শুশ্রূষাকারীকে বলিলেন—"খানিকটা আমানি যোগাড় করিয়া আন দেখি" তিনি বলিলেন "মহাশয় এ ধনী লোকের বাটী আমানি কোথা পাইব" তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন "যেখান হইতে হউক আনিতেই হইবে। দেখ প্রতিবাসীদের বাটীতে অবশ্যই আছে।" তখন শুশ্রূষাকারী বলিলেন "এখন সকলেই নিদ্রিত তথাপি আমি চেষ্টা দেখিব কিন্তু আমি যাইলে মহাশয় রোগীকে দেখিবেন ও বরফ এবং ঔষধ যথা সময়ে দিবেন।" বৃদ্ধ বলিলেন "ঔষধ টান মারিয়া ফেলিয়া দেও এবং শীঘ্র আমানি আন আমি বসিয়া রহিলাম।" তখন শুশ্রূষাকারী সদর দরজার চাবি খুলিয়া এবং দরওয়ানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। আশ্চর্য্য এই যে, যে বাটীতে প্রথমে যাইলেন তথায় গৃহস্বামী একডাকে উত্তর দিয়া দরজা খুলিলেন এবং প্রার্থিত আমানি তখনই একটি মৃৎপাত্রে করিয়া

দিলেন। গৃহস্বামী দরিদ্র লোক বলিয়া তাহার হস্তে একটি টাকাদিয়া শুশ্রূষাকারী সত্বরপদে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া আমানি প্রাচীনের হস্তে দিলেন। তখন বৃদ্ধ বলিলেন "অল্প সৈন্ধব লবণ আবশ্যক তোমাদের বাটীর কর্ত্তী সৈন্ধব ব্যবহার করেন তাঁহার দাসীকে জিজ্ঞাসা কর সে দিবে।" শুশ্রূষাকারী এই কথামত দাসীর নিকট হইতে সৈন্ধব আনাইলেন। অনন্তর উহা আমানির সহিত মিশাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রোগীকে এক নিশ্বাসে পান করিতে বলিলেন। রোগী উহা যেন অমৃত পান করিলেন এবং পনর মিনিট পরে প্রস্রাব ত্যাগ করিলেন ও বলিলেন আমি একটু ঘুমাইব। বৃদ্ধ বলিলেন "ঘুমাও বাবা কিন্তু প্রাতে ঠিক ৮ ঘটিকার সময় উঠিও।" ইহা বলিয়া শুশ্রূষাকারীকে বলিলেন দেখ আর কোন চিন্তা নাই। ইহাকে ঘুমাইতে দেও কোন ঔষধ দিও না—খুব সাবধান। ঔষধ দিলে আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রাতে উহার জন্য পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন ঘুটার জ্বালে রাঁধিয়া গাদাল পাতার ঝোল দিয়া অল্প পরিমাণে খাইতে দিও আর আমানি যত বার ইচ্ছা হইবে পান করিতে দিও।" শুশ্রূষাকারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন ও ব্রাহ্মণকে একটু বসিতে বলিয়া বাটীর গৃহিনী অর্থাৎ রোগীর মাতাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার বলিবার জন্য ত্বরায় উপরে গেলেন। গৃহিনী এই কথা শুনিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্মাননা ও সৎকার করিবার ইচ্ছায় যে ঘরে রোগী ছিলেন তাঁহার সঙ্গে সেই ঘরে দ্রুত পদে গমন করিলেন। নীচে আসিয়া দেখেন যে রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় নাই। তখন প্রায় অরুণোদয় হয় হয় সদর দরজা যেমন বন্ধ তেমনি রহিয়াছে, দ্বারপালদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল কিন্তু প্রাচী ব্রাহ্মণকে আর কেহ কখনও দেখিল না। ইহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া কাহার নাম প্রকাশ করা গেল না; কিন্তু পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এ ঘটনা সম্বন্ধে প্রমাণ আমার নিকট পাইতে পারিবেন।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

১ম ভাগ।] শ্রাবণ, ১৩০৪। [৪র্থ সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

মাসিক পত্র।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়।
৩৯।১নং, মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট বিভাবতী প্রেসে
শ্রীসন্ন্যাসীচরণ বৈরাগী দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ একটাকা, মফঃস্বলে ১৷৵০ আঠার আনা।
প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৶০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দেড় আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। প্রতি মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে "পন্থা" প্রকাশিত হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ আমাদিগকে জানাইবেন, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। টাকা-কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৴০ আনা কমিশন লাগিবে।

৪। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৫। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে, অথবা মনি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়
৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।
প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে, পত্র লিখিলে অথবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত বন্দবস্ত হইয়া থাকে।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

১ম ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৪। { ৪র্থ সংখ্যা।

সফল সাধনা।

স্বর্ণ বরণ চন্দ্র কিরণ সিন্ধুর নীল অঙ্গে,
নিন্দিত নীলকান্ত দ্যুতিঃ প্রতিবিম্বিত তরঙ্গে'।
স্থির গভীর নির্ব্বাক নীর নিদ্রায় যেন মগ্না,
পুষ্পিত শ্যাম প্রান্তর তট সুখ শয্যায় লগ্না।
চপল চটুল উর্ম্মি শিশুরা কৌতুক ক্রীড়া ক্লান্ত,
নিদ্রিত মা'র বিশাল বক্ষে বন্ধনে স্নেহাক্রান্ত।

স্তব্ধ মৌন নিশীথ রাত্রি শীতল মন্দ বায়,
জ্যোৎস্না-ধৌত সুনীল অভ্রে চন্দ্র তারকা ভায়।
শান্ত মহান সিন্ধুর তীরে উপল খণ্ড আসনে,
শোভন মূর্ত্তি গৌর কান্তি মণ্ডিত সিত বসনে,
নবীন যুবক, মগন ধ্যানে; কুঞ্চিত কেশ-জাল
লুটিছে, আবরি বয়ান চক্ষু পৃষ্ঠ বক্ষ ভাল।

সম্মুখে তাঁর চিত্র লেখনী সজ্জিত থরে থরে।
মৌনতা ভেদ করিয়া সহসা মর্ম্ম-পীড়িত স্বরে—
কহিলা শিল্পী,—"মিছা কল্পনা জল্পনা যত মোর।
"গভীর মাঝে অনন্তে চাহি বান্ধিতে দিয়া ডোর!
"উন্মাদ হেন যদি এ প্রয়াস, ক্ষম দেবি! অপরাধ।
"অর্পিনু আজি পদতলে তব যত কিছু আশা সাধ।
"যুগ যুগান্ত সাধনা-লব্ধ ব্যর্থ রত্ন রাজি,
"লহ লহ ফিরে, অঞ্জলি ভরি আসিয়াছি দিতে আজ।
"লহ ফিরে লহ তোমারি দত্ত যশের পুষ্প মালা।
"লহ নিষ্ফল জীবন তুচ্ছ অভিশাপ বিষে ঢালা।
"তোমারেই যদি, ইষ্ট দেবতা! সাধনার ফল মম,
"নাহি পেনু আজো, বিশ্ব নিখিলে কিবা তবে প্রয়োজন!
"আজিও তোমার সৌন্দর্য্য রাশি না পারিনু ধরিবারে।
"পারিনা রহিতে চির অতৃপ্ত বহিয়া হৃদয় ভারে।"
অশ্রু সলিলে আপ্লুত আঁখি, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।
মার্জ্জিত করি বসনে নেত্র, চাহিলা তাহার পর—
বারেক শূন্য, অরণ্য পুনঃ, বারেক সিন্ধুপানে,
চঞ্চল আঁখে ব্যাকুল প্রাণে যেন কার সন্ধানে।
তার পর ধীরে সিন্ধুর নীরে, চিত্রিত পটগুলি,
একে একে সব লেখনী যন্ত্র বিবিধ বর্ণ তুলি,
করি নিক্ষেপ; ত্যজিয়া আসন উঠিলা চিত্রকর,
নতকরি আঁখি মুহূর্ত্ত তরে দাঁড়াইলা স্থিরতর;
তার পর বেগে পলক ফেলিতে বিস্তারি বাহু দুটি,
ঝাঁপ দিলা জলে, মাতৃবক্ষে শিশু যথা যায় ছুটি।

(২)

*   *   *   *   *   *   *

সহসা জ্যোৎস্না হইল মলিন চন্দ্র তারকা ডুবিল!
লক্ষ সূর্য্য রশ্মি প্রভা সিন্ধু ভেদিয়া উঠিল!
মনোমোহকর সৌরভে দিক্ দিগন্ত পরি ব্যাপিল!
বৃন্দ বৃন্দ মুরলী রবাব সারঙ্গ বীণা বাজিল!
জ্যোতির মাঝে স্বর্ণ কমল অরণ্য উদ্ভাসিল!
কমল কাননে জ্যোতির্ম্ময়ী কমলে-কামিনী হাসিল!
জ্যোতির্ম্ময় পদযুগ তটে অচেত চিত্রকর।
সুরাঙ্গনারা যন্ত্রের সাথে মিলায়ে মধুর স্বর,—
মূর্চ্ছা আতুর হিয়ে দিল ঢালি অমিয়া সঞ্জীবন।
ভাঙ্গিল মোহ, ধীরে আঁখি যুবা করিলা উন্মীলন।

(সুরাঙ্গনাদের গীত।)

জাগো ওগো জাগো সখা,
চাহ মীলিত আঁখি।
যুগান্ত তপ জীবনান্ত পন,
(হের) সফল তব আজি।
বিষাদ শেষ ত্যজিয়া এবে
উঠগো অভিমানী।
দুর্লভ তম শান্তি আসন
(হের) মুক্ত তোমার লাগি।

বিস্ময়ে যুবা চাহি চৌদিকে ঘুরিয়া উঠিল শির,
আননে মধুর হাস্য ফুটিল, নয়নে বহিল নীর।
আবেগে বক্ষে চাপিয়া চরণ কহিলা আকুল স্বরে—
"দয়া কি হইল ভক্ত সেবকে দেবি, এতদিন পরে?

"কতনা করেছি কঠোর সাধনা তব দর্শন তরে ;
"অন্তিম কালে পুরাতে বাসনা আসিলে কি দয়া করে ?"

সাদরে স্নেহে ধরিয়া হস্ত তুলিয়া লইলা কোলে ;
মুছায়ে অশ্রু চুম্বিয়া মুখ মধুর স্নেহ বোলে
কহিলা দেবতা "বৎস ! তোমার সাজে বটে অভিমান ;
ভক্তের কাছে নত মস্তক ভক্তেরি ভগবান।
যতদিন তবু বন্ধন সব ছিন্ন নাহিক হয়,
যতদিন তবু যশের লিপ্সা হৃদয়ে তাহার রয়,
ততদিন তারে নাহি দিই ধরা অলক্ষ্যে তার রই ;
সকল স্বার্থ তেয়াগে যখনি তখনি তাহার হই।
আজিকে তোমার মুক্ত বাঁধন, পাতিয়াছি আজি কোল্ ;
যুগান্ত তপে কঠোর দুঃখ আজিকে বৎস ভোল !
চির উজ্জ্বল বিজলীমাল্য এইনে পুরস্কার ;
ঘুচে অশান্তি সর্ব্ব, এই প্রভাবে পুষ্পহার।

পরি এ মাল্য কণ্ঠে বৎস ! ফিরে যারে আর বার ;
এখনো সময় হয়নি পূর্ণ ধরা হ'তে আসিবার।
এইনে আরেক হিরণ্য তুলি মন্ত্রাভিষেক করা ;
মনে কল্পনা করিবি যা যবে তখনি দিবে সে ধরা।
তোমার চিত্র করিবে সৃষ্ট নূতন স্বর্গ লোক,
দেখি সে দৃশ্য মুগ্ধ মানব ভুলিবে দুঃখ শোক।"

শ্রীমতী মৃণালিনী।

পৌরাণিক কথা।

সৃষ্টির উপক্রম।

কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় পুরাণের বিষয়।
সৃষ্টি দুই প্রকার, কারণ সৃষ্টি ও কার্য্য সৃষ্টি।
জীব সৃষ্টিই কার্য্য সৃষ্টি। জীবের উপাদান সৃষ্টির নাম কারণ সৃষ্টি।
এই কারণ সৃষ্টিকে তত্ত্ব সৃষ্টি বলা হইয়াছে।
কারণ সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা প্রথমে দেখা যাউক।

প্রলয় কালে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই মূলপ্রকৃতির ক্ষেত্রে লীন। সমগ্র জগৎ বীজ ভাবে সেই মূলপ্রকৃতিতে অবস্থিত। কিন্তু কোন পদার্থের সে সময়ে নাম কিম্বা রূপ ছিল না। নাম ও রূপ দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে "অব্যাকৃত" বলে। অব্যাকৃত পদার্থ মাত্রই এক।

অব্যাকৃত জগদাত্মক মূলপ্রকৃতি যাঁহার শরীর, তিনিই প্রথম পুরুষ। প্রলয় কালে তিনিই এক। "তিনি" বলিলে, তাঁহার শরীরকেও বুঝিতে হইবে। সেই শরীরেই অব্যাকৃত ভাবে জগৎ নিহিত।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ছা—উ ৬-২-১।
শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে উল্লিখিত অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন।

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ছা—উ-৬-২-৩।

তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে জায়মান হইব। ভগবানের ইচ্ছা কেন হইল এবং সেই ইচ্ছায় সৃষ্টি কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল?

"ভগবানেক আসেদ মগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ॥
সবা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মনাং সুপ্তশক্তি রসুপ্ত দৃক॥
সবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥

কাল বৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।।
ততোঽভবন মহত্তত্ব মব্যক্তাৎ কাল চোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জং স্তমোনুদঃ।।"

ভাঃ পুঃ ৩-৫-২৩ হইতে ২৭।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ছিলেন, যিনি সকল জীবের আত্মা। (সে সময়ে অন্য দ্রষ্টা কিম্বা দৃশ্য ছিল না। যদিচ এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল, তথাপি তাহার পৃথক্ প্রতীতি ছিল না। শ্রীধর) ভগবান্‌কে উপলক্ষণ করিতে, তখন কোন রূপ নানাত্ব বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনিই তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকাশ ছিল না। সুতরাং দৃশ্য কিছুই না দেখিয়া, তিনি যেন আপনাকেও (ঈশ্বররূপে) না থাকা মনে করিলেন। তাঁহার মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন নিদ্রিত ছিল। কিন্তু দৃষ্টি (বহির্দৃষ্টি) রূপ চৈতন্য তখন প্রকট হইয়াছিল। সেই দ্রষ্টার কার্য্য কারণাত্মক প্রসিদ্ধ শক্তির নাম মায়া। এই মায়া দ্বারাই ভগবান্ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাল শক্তি দ্বারা মায়ার গুণ সকল ক্ষুভিত হইলে, ভগবান্ পুরুষ রূপী স্বীয় অংশে সেই মায়াতে চিৎশক্তি রূপ আত্ম বীর্য্যের আধান করিলেন। এবং কাল প্রেরিত অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্তত্ব উদ্ভূত হইল। ভগবান্ এইরূপে আত্ম দেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশিত করিলেন।"

সৃষ্টির এই উপক্রম বর্ণনায়, তিনটী বিষয় পাওয়া যায়—

১। ঈশ্বরের ইচ্ছা।
২। মায়া।
৩। কাল শক্তি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কাল শক্তি কি।

ইংরাজিতে যাহাকে Periodicity বলে, তাহা কালশক্তির অনেক অংশের জ্ঞাপক।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এক ঋতুর পর অন্য ঋতু, আবার সেই ঋতুর পুনরাগমন। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ,

মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, কল্পের পর কল্প। যে শক্তি অনুসারে এইরূপ নিত্য অনুবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তন হয়, তাহাই কাল শক্তি। প্রকৃতির যাহা কিছু আছে, সকলই এই শক্তির বশানুগ। সকলই কাল প্রভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব কাল প্রাকৃতিক সীমার অতীত। কালশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। এবং ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী।

"এতদ্ভগবতো রূপং" ভাঃ-পুঃ ৩-২৯-৩৬।

এই কাল ভগবানের অন্যতম রূপ।

কাল হইতে কি হয়?

কালাদ্ গুণ ব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥ ভাঃ—পুঃ ২-৫-২২।

সৃষ্টির উপক্রমে, কাল হইতে গুণের ক্ষোভ হয়, স্বভাব হইতে পরিণাম হয়, এবং পুরুষাধিষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে মহতত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, মায়ার এই তিন গুণ হইতেই সৃষ্টির কার্য্য হয়। প্রলয়কালে এই তিন গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। যখন প্রলয় রাত্রির অবসান হয়, তখন কালবশে গুণ সকল পুনরায় কার্য্যোন্মুখ হয়। সৃষ্টির কাল আগত না হইলে, সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার এক রাত্রি অতীত না হইলে, গুণ সকলের ক্ষোভ হয় না। এইজন্য কাল সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ মায়া, যাহাকে অন্য শ্লোকে স্বভাব বলা হইয়াছে। মায়ার ধর্ম্ম পরিণাম। মায়াই সকল পদার্থের স্ব-ভাব, অর্থাৎ স্বকীয় ভাব। কারণ পুরুষ সকল জীবেই সমান। মায়ারূপ উপাধি লইয়াই, সকলের "আমিত্ব"। এই মায়া, স্বভাব, বা প্রকৃতি সর্ব্বদা পরিণামশীল।

আজি বৃক্ষে যে আম্র মুকুল দেখা যাইতেছে, কিছুদিন পরে দেখিব সে একটী পক্ক আম্র। অবস্থার এই পরিণাম, যদিও প্রতিদিন আমরা দেখিতে পাই না, তথাপি প্রতিক্ষণ তাহার প্রবাহ চলিতেছে। বালক যুবা হইতেছে, প্রাকৃতিক পদার্থ সকল একভাব ত্যাগ করিয়া অন্য ভাব আশ্রয় করিতেছে। এই পরিণাম প্রকৃতির আত্মধর্ম্ম। গুণদ্বারা এই পরিণাম সিদ্ধ হয়। এই পরিণামই প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে ভিন্ন করে। প্রলয়কালে গুণ সকল প্রসুপ্ত থাকে, এইজন্য পরিণামও তখন নিরুদ্ধ হয়।

গুণের ক্ষোভ হইলেই, প্রকৃতির পরিণাম হয়। কিন্তু সেই পরিণাম কি কোন নিয়মের বশবর্ত্তী, না যে কোনরূপে যে কোন পরিণাম হইলেই হয়।

"কর্ম্ম" ঐ পরিণামের নিয়ামক। কর্ম্মশব্দে জীবের অদৃষ্ট। পূর্ব্ব কল্পের জীব সকল যখন প্রলয়গ্রস্ত হয়, তখন তাহাদের শরীরের নাশ হয়, কিন্তু তাহাদের সংস্কার সকল অদৃষ্ট ভাবে ঈশ্বরে লীন হয়। ঐ অদৃষ্টই জীবের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই, ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা করেন। অন্তর্নিহিত জীব সকল ও জীবভোগ্য স্থান সকল জীবের কর্ম্ম অনুসারে প্রকাশ করাই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বরের অন্য ইচ্ছা কিছুই নাই। এইজন্য এক শ্লোকে যাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে তাহাকে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরাধিষ্ঠান কর্ম্মে কেন, সকল বিষয়েই আছে। মায়াও কালও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত।

কর্ম্ম অনুসারে মূলপ্রকৃতি মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়, মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্বে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই পরিণামের ক্রম কারণসৃষ্টির প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

এখন দেখা গেল, ঈশ্বর কেন বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, স্বভাব ও কর্ম্ম হইতে কিরূপে সৃষ্টির উপক্রম হয়।

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষু রুপাদদে॥ ভাঃ—পুঃ ২-৫-২১।

বিবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া, মায়ার ঈশ্বর ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছা প্রাপ্ত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই মায়ার ঈশ্বর ভগবান্, যাঁহাকে আমি প্রথম পুরুষ বলিয়াছি, প্রলয় কালে একক ছিলেন। যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ প্রলয় কালে লীন হইয়া অব্যাকৃত ভাবে তাঁহার মায়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেই অব্যাকৃত মায়া তাঁহার শরীর। প্রলয় কালে তিনি স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। যেমন সুষুপ্তি কালে জীব সকল আপনাতেই মগ্ন হয়, বহির্জগতের কি আপন শরীরের জ্ঞান তাহার থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বর প্রলয় কালে সুষুপ্ত ছিলেন। তখন তাঁহার শরীরের জ্ঞান ছিল না। শরীরও তখন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ছিল। তাঁহার স্বরূপাবস্থানই জগতের প্রলয়। যখন ঈশ্বর জাগরিত হন, অর্থাৎ বহির্মুখ হইয়া আপনার শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখনই প্রকৃতি সৃষ্টির পথ অনুসরণ করে। তাঁহার দৃষ্টি মাত্রেই মায়া অনুপ্রাণিত ও পরিণামগামী হয় এবং তত্ত্ব সমুদয় যথা ক্রমে আবির্ভূত হয়।

যে সৃষ্টির কথা বলা হইল, ইহা কাল্পিক সৃষ্টি। প্রতি কল্পে এইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আদি সৃষ্টির কথা পুরাণে নাই এবং পুরাণের মতে আদি সৃষ্টিও নাই। কারণ, সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি। বেদান্তের সিদ্ধান্ত মতে ছয় বস্তু প্রবাহ রূপে অনাদি, যথা ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, অবিদ্যা, অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ, এবং অনাদি বস্তুর পরস্পর ভেদ।

তত্ত্বের স্বরূপ ও উদ্ভবক্রম জানিবার জন্য গুণের বিষয় জানা আবশ্যক। এই জন্য পর প্রবন্ধে গুণের বিচার করা হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ধ্রুব চরিত্র।

ধ্রুব চরিত্র পৌরাণিক আখ্যান। হিন্দু শাস্ত্রে পুরাণের স্থান অতি উচ্চ। শ্রুতিতে ইহাকে ঈশ্বরের নিশ্বাস স্বরূপ বলা হইয়াছে। 'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্'। পুরাণ প্রধানতঃ সরস অধ্যাত্মবিদ্যা; উপাখ্যান ছলে পুরাণে অতি উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকতা ও ধর্ম্মোপদেশের অবতারণা করা হইয়াছে। পুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ খানি। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ এক খানি অতি উপাদেয় ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত শ্রীধর স্বামী তাঁহার বিষ্ণুপুরাণ টীকার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন। 'পুরাণত্বাবিশেষেঽপি উপাখ্যানলঘুত্বেন জগজ্জীবাত্মপরমাত্মনাম্ ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদনাভ্যাসবসাদ্ অত্রৈব পুরাণে মুমুক্ষুণাং প্রবৃত্তি রুচিততমা।' অর্থাৎ সকল পুরাণই পুরাণ বটে। কিন্তু মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির বিষ্ণুপুরাণ বিষয়েই বিশেষভাবে প্রযত্ন করা উচিত; যেহেতু ইহাতে উপাখ্যানভাগ (বাজে গল্প) অল্পই দৃষ্ট হয় এবং জীব জগৎ ও ঈশ্বরের একতা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে।' বিষ্ণু পুরাণে দুইটি ভক্তের আখ্যান লিখিত হইয়াছে—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। ঐ উপাখ্যানদ্বয়ের আলোচনা করিলে শ্রীধর স্বামীর উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান ভাগবতেও বিবৃত দেখা

যায়। ভাগবতও অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় পুরাণ। কথিত আছে ব্যাসদেব নানা পুরাণ রচনা করিয়াও চিত্ত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দেবর্ষি নারদের উপদেশ মতে ভগবানেরগুণ-বর্ণন-প্রধান ভাগবত পুরাণ রচিত করিয়া নিবৃ'ত হয়েন।

পুরানোক্ত আখ্যান দ্বয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ধ্রুব সকাম ভক্ত এবং প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্ত। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ উভয়েরই প্রতি বিষ্ণু সদয় হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। তখন উভয়ে হরির নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার তুলনা করিলেই বুঝা যায়, ধ্রুব সকাম ভক্ত এবং প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্ত।

ধ্রুবের প্রার্থনা এইরূপ—

আধার ভূতং জগতঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানং ত্বৎ প্রসাদাদতোব্যয়ম্॥

(বিষ্ণু ১। ১২। ৮২

'হে প্রভো! যে স্থান জগতের আধার স্বরূপ, যাহার ক্ষয় নাই এ বং াহ সর্ব্বোত্তমেরও উত্তম, আমি সেই স্থান আপনার প্রসাদে প্রার্থনা করি।'

প্রহ্লাদের প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার—

নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥"

(বিষ্ণু ১। ২০। ১৮

'হে নাথ! জন্ম জন্মান্তরে আমি যে সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিব সে সকল জন্মেই হে অচ্যুত যেন সদা তোমাতে আমার ভক্তি অচলা থাকে।'

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বর হস্তে ধরিয়া প্রহ্লাদকে সাধনা করিতেছেন, প্রহ্লাদ হরি ভক্তি ভিন্ন অন্য বর গ্রহণ করিবে না! প্রহ্লাদের মত নিষ্কাম কে?

ধ্রুবের ভক্তি যে সকাম, অতএব অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, ভাগবতেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষ্ণু সন্দর্শনের পর অভিলষিত বর লাভে সিদ্ধ কাম হইয়া ধ্রুব গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সোপি সংকল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্।
প্রাপ্য সংকল্প নির্ব্বাণং নাতি প্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্॥

৪। ৯। ২৭

'ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনফলে কামনার চরম বস্তু লাভ করিয়া অতি প্রীত না হইয়া পুরে প্রত্যাগমন করিল।' কামনায় চরম লাভ করিয়াও ধ্রুব অতি প্রীত নহে কেন? তাহার কারণ এই যে কামনার সীমান্তে উপনীত হইলে ধ্রুবের হৃদয়ে নির্বেদ উপস্থিত হয়। ধ্রুব বুঝিতে পারে যে সকাম ভাব অতি নিকৃষ্ট। ভাগবতকার তাহার মনের ভাব এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অহোবত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্থ পশ্যত
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তবৎ
ভবচ্ছিদমযাচেহহং ভব্যং ভাগ্য বিবর্জ্জিতঃ

৪।৯।৩১।৩৪

'হায়! মন্দভাগ্য আমার কি মোহ! যিনি সংসারের অন্তকারী তাঁহার চরণ লাভ করিয়া আমি সান্ত (ভঙ্গুর) বস্তু চাহিয়া লইলাম। ভাগ্যহীন আমি কিনা তাঁহার নিকট সংসারই যাচ্ঞা করিলাম।'

ইহা হইতে বুঝা যায় নিষ্কাম ভক্তির তুলনায় সকাম ভক্তি কত হেয়। ধ্রুবের এই নির্বেদ তাহার উত্তর জীবনে কিরূপ কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

ধ্রুবের উপাখ্যান অতি মধুর। সে উপাখ্যান বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সেই জন্য এখানে তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব। পরে ধ্রুব-চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাধনা বিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। বলা বাহুল্য এই সকলের আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের রচনা।

রাজা উত্তানপাদের দুই জন রাণী ছিলেন—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি 'সুয়ো' রাণী এবং সুনীতি 'দুয়ো' রাণী। সুনীতির গর্ভে রাজার ধ্রুব নামে ও সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অবশ্য সুয়ো রাণী সুরুচির পুত্র উত্তমই রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। ধ্রুবের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন এক দিন রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া তাহারও ক্রোড়ে উঠিবার লালসা হয়। রাজা ধ্রুবের বিমাতা সুরুচির ভয়ে তাহাকে ক্রোড়ে লইতে সাহসী হইলেন না। তখন গর্ব্বিতা সুরুচি সপত্নী

পুত্র ধ্রুবকে এইরূপ বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করিল। 'বৎস! তোমার এ দুরাশা কেন? তুমি ত আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই। রাজ সিংহাসন আমার পুত্র উত্তমেরই প্রাপ্য। সুনীতির গর্ভজাত তুমি ইহার যোগ্য নহ।' অভিমানী ধ্রুব বিমাতার বাক্যে কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মাতা সুনীতির নিকট সকল কথা নিবেদন করিল। সুনীতি সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। 'বৎস! তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছে। তোমার তেমন অদৃষ্ট নহে। সিংহাসন, রাজভোগ, এ সকল পুণ্যশালী ব্যক্তিই পাইয়া থাকে। পুণ্যবতী সুরুচির গর্ভে পুণ্যশীল উত্তমের জন্ম হইয়াছে। রাজাসন তাহারই প্রাপ্য। তুমি পূর্ব্ব জন্মে উত্তমের ন্যায় পুণ্য কর্ম্ম কর নাই, সেই জন্য ভাগ্যহীনা আমার গর্ভে জন্মিয়াছ। অতএব এ বিষয়ে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার এতই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবান হও। সুশীল হও, ধর্ম্মাত্মা হও, সর্ব্ব প্রাণীর হিত কর, তাহা হইলে জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্য তোমার প্রতি ধাবমান হইবে।' ধ্রুব বলিলেন 'মা! তোমার বাক্যে আমার চিত্তে সান্ত্বনা হইল না। যাহাতে আমি জগতের শ্রেষ্ঠতম স্থান লাভ করিতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট হইব। উত্তম তুচ্ছ সিংহাসন লইয়া সন্তুষ্ট থাকুক। পিতা তাহাকে সাম্রাজ্য প্রদান করুন। মা! যাহা অন্যে দিবে আমি সেরূপ পদ চাহি না। যাহা আমার পিতাও পান নাই এরূপ শ্রেষ্ঠতম পদ স্বীয় পুণ্য দ্বারা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি।'

ধ্রুব মাতাকে এই কথা বলিয়া রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী এক অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে দেখিল কুশাসনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া সাত জন ঋষি উপবিষ্ট আছেন। ইঁহারাই মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ধ্রুব তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিল আমি ধন, রাজ্য কিছুই চাহি না। যে সর্ব্বোত্তম স্থান কেহ কখন ভোগ করে, নাই, আমি তাহাই লাভ করিতে ইচ্ছা করি। কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।' ঋষিরা বলিলেন 'বৎস! বিষ্ণুর আরাধনা কর, তাহা হইলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।' পরে ঋষিরা শিশু ধ্রুবকে ভগবদারাধনার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন।

ধ্রুব সে অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া মধুবন নামক তীর্থে গমন করিয়া তথায় দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল। সে অনন্য মনে ভগবানকে ধ্যান করিয়া ঋষিপ্রোক্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। তাহার তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ ও উপদেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রনা করিয়া বিবিধ উপায়ে তাহার সমাধি ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। যেন ধ্রুবের মাতা সুনীতি সাশ্রু নয়নে তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। যেন রাক্ষসগণ বিকট শব্দ করিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যেন শত সহস্র শিবা জ্বালাময় মুখ ব্যাদান করিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দে আসক্ত চিত্ত ধ্রুবের সে সকল কিছুই ইন্দ্রিয় গোচর হইল না। সকল মায়া বিফল হইল দেখিয়া দেবতারা বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হইলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া চতুর্ভুজরূপে ধ্রুবকে দেখা দিলেন। ধ্রুব কৃতার্থ হইয়া তাঁহার স্তুতি করিল এবং শেষে ভগবানের নিকট অভিলষিত বর মাগিয়া লইল। ভগবান্ তাহাকে কল্পান্ত স্থায়ী ধ্রুবলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

সংক্ষেপে ইহাই বিষ্ণুপুরানোক্ত ধ্রুবোপাখ্যান। ভাগবতে ধ্রুবের যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা প্রায় সর্ব্বাংশে ইহার সহিত মিলে। বিষ্ণু পুরাণে দেখিতে পাই ধ্রুবের উপদেষ্টা মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি; কিন্তু ভাগবতে মহর্ষি নারদ উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। ধ্রুব যখন মধুবনে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হয়, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর। ধ্রুবের উত্তর জীবনের কোন উল্লেখ বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কাহিনী ভাগবতে বিবৃত আছে। ভাগবত পাঠে জানা যায় যে ধ্রুবের সিদ্ধি লাভের সংবাদ পাইয়া রাজা উত্তানপাদ অমাত্য বন্ধু সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপুরীতে ফিরাইয়া আনেন। তখন ধ্রুবের আদরের আর পরিসীমা থাকে না। কয়েক বৎসর গত হইলে বৃদ্ধ রাজা ধ্রুবের উপর রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। ধ্রুব বহু সহস্র বৎসর পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়া শেষ জীবনে মায়া বিরচিত জগতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যার জন্য প্রস্থান করেন। সেখানে শ্রীহরিতে নিষ্কাম ভক্তির অনুশীলন করিয়া অবশেষে দেহত্যাগ করেন।

হরৌভক্তিং ভগবতি প্রবহন্নজস্র
আনন্দ বাষ্প কলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ
বিক্লিদ্যমান হৃদয়ো পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসৌ ইতি মুক্ত লিঙ্গঃ

এইরূপে ধ্রুব শ্রীভগবানে পরাভক্তি অজস্র পোষণ করিয়া অভিমান শূন্য হইয়া নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল। তাহার নয়ন হইতে অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ভক্তিরসে আদ্র হইয়া গেল এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হইল।

অতএব দেখা যায় অবশেষে নিষ্কাম ভক্তিরই জয় হইল। এই সংক্ষেপে ধ্রুবের আখ্যান। ইহাতে অনেকগুলি জটিল দর্শন তত্ত্বের মীমাংসা আছে এবং সাধনপথের অনেক নিগূঢ় কথা বিবৃত আছে। বারান্তরে আমরা সে সকলের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভক্তি-তত্ত্ব।

অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অথ অনন্তরম্ অতঃ কারণাৎ ভক্তিজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ॥ ১ ॥

অনন্তর এই হেতু ভক্তিজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ বিধিপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে। অধ্যয়ন-সমকালে আপাততঃ যতটুকু পরিমাণে বেদার্থ অধিগত হওয়া যায়, তাহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান সাধনসাপেক্ষ। শমদমাদি সাধন ব্যতিরেকে প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান জন্মে না। পরে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে অর্থাৎ যথাযোগ্য কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই জ্ঞানোৎপত্তির সহিত অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের সহিত চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে। প্রকৃত চিত্তশুদ্ধিও সাধন-সাপেক্ষ। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান

দ্বারা প্রেমের অভ্যুদয় ভিন্ন প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। তবে আপাততঃ যে পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তাহাই উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেই নির্ব্বেদাধিক্যে জ্ঞানীর সঙ্গ ও নির্ব্বেদের অল্পতায় ভক্তের সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। নির্ব্বেদাধিক্য ভক্তিপথের কণ্টক স্বরূপ। কারণ, মুমুক্ষা উহার সহচর। মুমুক্ষা সত্ত্বে ভক্তি লাভ হইতে পারে না। ভোগেচ্ছা ও মোক্ষেচ্ছাকে শাস্ত্রে পিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা রূপ পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃ...য় বাস করে, সে পর্য্যন্ত ভক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব ভোগাভিলাষের ন্যায় মোক্ষাভিলাষও ভক্তিমার্গে একান্ত পরিত্যজ্য। এই নিমিত্তই বলিয়াছেন, যিনি বিষয়ে অনতিসক্ত ও অনতিবিরক্ত তিনিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়ে অনতিসক্ত হইলে, ভোগাভিলাষ ত্যাগ হইয়া যায়। আর উহাতে অনতি-বিরক্ত হইলে, মোক্ষাভিলাষও ত্যাগ হইয়া যায়। ঈদৃশ ভক্ত্যধিকারী ভক্তের সঙ্গ লাভে কর্ম্ম সকল অনিত্য-পরিমিত-ফলপ্রদ, পরমেশ্বর ভক্তিমাত্রলভ্য এবং অক্ষয় অনন্ত চিৎসুখস্বরূপ নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী সেই পরমেশ্বরই জীবের নিত্যসুখের কারণ, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। উক্ত বিশ্বাসের পর হইতেই ক্রমশঃ কাম্যকর্ম্মাদির ত্যাগের সহিত মুমুক্ষারও ত্যাগ হইতে থাকে। এই সময়েই ভক্তিজিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়। যেখানে পূর্ব্বোক্ত ক্রমনিয়ম ভঙ্গ করিয়াই ভক্তিজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তি দৃষ্টি হইবে, সেখানে জন্মজন্মান্তরীয় তত্তদনুষ্ঠান কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। কারণ, উক্ত শাস্ত্রীয় ক্রম অলৌকিক প্রত্যক্ষের গোচর। উহা যোগিগম্য বলিয়াই যে স্বীকার করিতে হইবে, এমন নয়, লোকেও উহা সচরাচর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়ম অব্যভিচারী। অতএব সর্ব্বত্রই উক্ত নিয়মের কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা শব্দ দ্বারা বিচার আক্ষিপ্ত হইতেছে। ভক্তির সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক উঠিয়া থাকে, এবং তদ্দারা ভক্তির নিবৃত্তিও ঘটিতে পারে, এই নিমিত্ত ঐ সকল কুতর্কের নিরাসার্থ ভক্তিবিচারের প্রয়োজন। ভক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় বলিয়াই ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিন্যাসে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচার সাধনবিচার ও পুরুষার্থ বিচার দ্বারা ভগবানই একমাত্র

উপাস্য এবং প্রীতির বিষয় এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার দৃঢ়তর ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিবিন্যাসে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শাস্ত্রাদিতে নৈপুণ্য লাভ দূরে থাকুক, যাঁহার বিশ্বাসও কোমল, অর্থাৎ বিরুদ্ধ শাস্ত্রাদি প্রদর্শনে যাঁহার বিশ্বাস অল্পায়াসেই শিথিল করা যাইতে পারে, তিনিই ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী।" এইরূপে ভক্তির চ্যুতির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন —"হে নাথ! সহস্র সহস্র জীবযোনির মধ্যে যে যোনিতে গমন হউক না কেন, সেই যোনিতেই যেন তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে" ইত্যাদি। অতএব ভক্তির অঙ্গভূত যে ভক্তিবিচার, তাহা কর্ত্তব্যই হইতেছে॥ ১॥

লৌকিক আকার ব্যতিরেকে অর্থাৎ লক্ষণ ব্যতিরেকে কোন বস্তুই রবুদ্ধি বিষয় হয় না বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে—

সা তু স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষরূপা॥ ২॥

ঐ ভক্তি স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষরূপ॥ ২॥

স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিতে শ্রীভগবদ্বিষয়ক অনুকূল অনুশীলন অর্থাৎ তদ্বিষয়ক অনুকূল জ্ঞান অনুকূল ইচ্ছা ও তদনুরূপ ক্রিয়া ইহাই বোধিত হইতেছে। অতএব ভক্তিশব্দে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রিত ভগবৎসম্বন্ধি সেব্যত্বজ্ঞান এবং তৎসম্বন্ধী সেবাভিলাষ ও তদনুরূপ চেষ্টা তিনই বুঝাইতেছে। চেষ্টা দ্বারা ইন্দ্রিয়তাদাত্ম্যাপন্ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত একতাপন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি, অভিলাষ দ্বারা মনস্তাদাত্ম্যাপন্ন অর্থাৎ মনের সহিত একতাপন্ন মনোবৃত্তি এবং জ্ঞানদ্বারা স্বাভাবিকী আত্মবৃত্তি বোধিত হওয়াতে ঐ তিনটিরই ভক্তিত্ব সূচিত হইতেছে। প্রথম প্রকার ভক্তির নাম সাধনভক্তি এবং দ্বিতীয় প্রকার ভক্তির নাম ভাবভক্তি। আত্মবৃত্তি জ্ঞান তৃতীয় প্রকার। তৃতীয় প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ যে প্রেমভক্তি তাহা ঐ জ্ঞানেরই সারাংশ। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার ভক্তিরই সাধারণ নাম সাধ্যভক্তি। এই নিমিত্তই ভক্তিশাস্ত্রবেত্তারা ভক্তির সাধ্যরূপা ও সাধনরূপা দুইটি অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধন ভক্তি দ্বারা লব্ধব্য ভাবরূপ ও প্রেমরূপ অবস্থাদ্বয়ই ভক্তির সাধ্যাবস্থা। আর গুরুপাদাশ্রয়াদি ক্রিয়ারূপ ভক্তির অঙ্গ সকলই ভক্তির সাধনাবস্থা বা সাধন

ভক্তি। এখন দেখা যাউক, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বলিতে কি বুঝায় এবং তদাশ্রিত ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানাদিই বা কিরূপ?

বেদ বলিয়া থাকেন, "শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ।" সৎ চিৎ ও আনন্দ যাঁহার স্বরূপ; অর্থাৎ যিনি স্বরূপতঃ সন্ময় চিন্ময় ও আনন্দময়, তিনিই শ্রীভগবান। আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে, ইহাই বলিতে হয় যে, সত্ব চিন্ময়ত্ব ও আনন্দময়ত্ব এই তিনটি ধর্ম্মবিশিষ্ট যাঁহার স্বরূপ, তিনিই শ্রীভগবান। অস ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন সৎ শব্দ সত্তাবাচক। যাঁহার অব্যভিচারী সত্তা আছে, যাঁহার সত্তা দেশকালাতীত, অর্থাৎ দেশ ও কাল দ্বারা পরিমেয় নহে, অর্থাৎ যিনি সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেই নিত্য বস্তুই সৎ শব্দের বাচ্য। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সত্তা বা নিত্যস্বরূপ একটি ধর্ম্ম বা শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। চিত ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন চিৎ শব্দ চৈতন্যবাচক—জ্ঞানবাচক। যাঁহার চৈতন্যত্ব আছে—যাঁহার জ্ঞানত্ব আছে, অর্থাৎ যিনি চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট—জ্ঞানধর্ম্মসম্পন্ন, তিনিই চিৎ শব্দের বাচ্য। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের চিদ্ধর্ম্ম বা জ্ঞানধর্ম্মরূপ অপর একটি ধর্ম্ম বা শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আ পূর্ব্বক নন্দ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন আনন্দ শব্দ পূর্ণসুখবাচক—পরিপূর্ণ-প্রেম-বাচক। যাঁহার ভূমানন্দত্ব আছে—যাঁহার পূর্ণসুখত্ব আছে—যাঁহার পরিপূর্ণ প্রেমরূপত্ব আছে, অর্থাৎ যিনি ভূমানন্দধর্ম্মবিশিষ্ট—পূর্ণসুখধর্ম্মযুক্ত—পরিপূর্ণপ্রেমধর্ম্ম-সম্পন্ন, তিনিই আনন্দ শব্দের বাচ্য। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের আনন্দধর্ম্মরূপ তৃতীয় ধর্ম্ম বা শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিময় বা শ্রীভগবান স্বরূপ-শক্তিময়; অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ শক্তিই শ্রীভগবানের স্বরূপ বা স্বরূপ-লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন শ্রীভগবানের আরও দুইটি লক্ষণ আছে। ঐ দুইটি লক্ষণ যথা, তটস্থলক্ষণ ও অস্বরূপলক্ষণ। যে লক্ষণ স্বরূপ নহে, পরন্তু যাহা স্বরূপের তটবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপ না হইয়াও স্বরূপের সদৃশভাবেই পরিলক্ষিত হয়, তাহাই তটস্থলক্ষণ। আর যে লক্ষণ স্বরূপ নহে এবং যাহা স্বরূপের সদৃশভাবেও স্ফূর্ত্তি পায় না, অথচ যাহা তটস্থলক্ষণের ন্যায় স্বরূপেরই বোধক হইয়া লক্ষণের মধ্যে গণ্য হয়, তাহারই নাম অস্বরূপলক্ষণ। স্বরূপে

অপ্রকাশ এবং স্বরূপের অপ্রকাশে প্রকাশ ধারণ করাতেই উহার অস্বরূপ আখ্যা হইয়াছে। স্বরূপশক্তির ছায়া এবং উহার বিভিন্ন অংশই যথাক্রমে অস্বরূপশক্তি ও তটস্থশক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা যাহাকে মায়া বলি, তাহাই অস্বরূপশক্তি এবং যাহাকে জীব বলি, তাহাই তটস্থশক্তি। মায়াশক্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য দ্বারা স্বরূপের বোধ করাইলেও উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না বলিয়াই উহাকে অস্বরূপশক্তি বলা হইয়া থাকে। আর জীবশক্তি স্বরূপের লক্ষক না হইয়া স্বরূপের সাধর্ম্ম্যের লক্ষক হয় বলিয়াই উহাকে তটস্থশক্তি বলা হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তি সূর্য্যস্থানীয়। মায়াশক্তি ছায়াস্থানীয়া। আর জীবশক্তি কিরণ-পরমাণু-স্থানীয়া। ছায়াকে যেমন সূর্য্যের অপ্রকাশ ভিন্ন তাঁহার স্বরূপ বলা যায় না, মায়াকেও তদ্রূপ পরমেশ্বরের অপ্রকাশ ভিন্ন তাঁহার স্বরূপ বলা যায় না। তবে ছায়ার ন্যায় মায়াতে বোধকতা স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ ছায়া যেমন ছায়াযুক্ত বস্তুকে বোধ করায়, তদ্রূপ মায়াও মায়ী পরমেশ্বরকে বোধ করাইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মায়ার কার্য্য যে জগৎ সেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তত্তৎকার্য্যের কারণ যে পরমেশ্বর তিনি বোধিত হইয়া থাকেন। আবার অন্ধকার যেমন আলোকের প্রতীতির বা অভিব্যক্তির স্থান, মায়াও তদ্রূপ মায়ী পরমেশ্বরের প্রতীতির বা অভিব্যক্তির স্থান। কারণ মায়া ব্যতিরেকে অন্ধকার ব্যতিরেকে আলোকের প্রতীতির ন্যায় পরমেশ্বরের প্রতীতি বা অভিব্যক্তি কিছুই হইতে পারে না। মায়া বা মায়ারচিত সংসার আশ্রয়পূর্ব্বক পরমেশ্বর আপনার শক্তি সকলকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। জীবশক্তি সকল পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। জীবকে পরমেশ্বরের অংশ না বলিয়া বিভিন্নাংশ বলিবার বিশেষ হেতু আছে। অংশ দ্বিবিধ; স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। যে অংশ সর্ব্বতোভাবে অংশীতেই সংস্থিত থাকিয়া ও অংশীর গুণে গুণী হইয়া অংশীর নিজ কার্য্য সংসাধন করেন তাঁহাকেই স্বাংশ বলা যায়। আর অংশীর যে অংশ তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া বহির্ম্মুখতাপন্ন হয়েন, তাঁহাকেই বিভিন্নাংশ বলা হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের অবতার সকলই তাঁহার স্বাংশ এবং জীব সকল তাঁহার বিভিন্নাংশ।

কারণ অবতার সকল পরমেশ্বরের সহিত সর্ব্ববিষয়েই একতাপন্ন; কিন্তু জীব সকল তদ্রূপ নহেন। মায়াবৃত বহির্ম্মুখ জীব সকল গুণক্রিয়াদিতে পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবাপন্ন। এই পৃথক্‌ভাবই জীবের লক্ষণ। জীব যখন মুক্তদশায় পরমেশ্বরের সহিত অপৃথক্‌ভাবাপন্নও হয়েন, তখনও তাঁহার জীবত্বের অত্যন্তোচ্ছেদ না হওয়াতেই বদ্ধজীবের সহিত শুদ্ধজীবের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখা যায়। শুদ্ধ জীব সকল স্বরূপশক্তির তুল্যাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কি অস্বরূপভূতা মায়াশক্তি কি অপৃথক্‌ভূত স্বাংশ বা অবতার সকল কি পৃথক্‌ভাবাপন্ন বিভিন্নাংশ বা জীব সকল ইঁহারা সকলেই স্বরূপশক্তিরই অবস্থাভেদ মাত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

প্রকৃতি।

(প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠার পর)

সাংখ্যশাস্ত্রে ভগবান্ মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে প্রধান নামে অভিহিত করেন। যিনি সমস্ত জগতের উপাদান, যাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা হইতে আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বশক্তিমান্ কি আছে? সুতরাং প্রকৃতিই প্রধান। প্রকৃতির দুইটি অবস্থা এক সাম্যাবস্থা অপর বৈষম্যাবস্থা। সাম্যাবস্থা প্রলয়কাল; বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টিকাল। সাম্যাবস্থা হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়। ঐ অবস্থাবিশিষ্ট প্রকৃতির নাম প্রধান। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ; ইহার সাম্য ও বৈষম্য দ্বারাই সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট গুণত্রয়ের অপর একটি নাম অব্যক্ত; অব্যক্ত হইতেই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি এবং অব্যক্তেই লয়। (অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত! অব্যক্তনিধনান্যেব তত্রকাপরিদেবনা)। এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থামাত্র এই বিশাল জগতের

ভাব ইহাই বুঝাইয়াছেন। ব্যক্তাবস্থা স্থূল, অব্যক্তাবস্থা সূক্ষ্ম। স্থূল সূক্ষ্ম অনন্ত প্রকৃতিময় এই অনন্ত জগৎ। প্রকৃতির কারণ অবস্থা অব্যক্ত, কার্য্য অবস্থা ব্যক্ত। মহাপ্রলয়ে নিখিল জগতের পরমকারণে অবস্থান। মহাপ্রলয়বিশিষ্ট প্রকৃতির নাম মূল প্রকৃতি প্রধান ও পরম অব্যক্ত বা পরম সূক্ষ্ম। পরম অব্যক্ত সত্ত্ব রজঃ তমো গুণত্রয় স্বরূপ মূল প্রকৃতি অনুমান সিদ্ধ। সত্ত্ব রজঃ তমোময় স্থূল সূক্ষ্মভাবে জগতের কার্য্য কারণ ভাব দেখিয়া সমস্ত জগতের মূল কারণ সত্ত্ব রজঃ তমোময় পরম সূক্ষ্ম বা পরম অব্যক্ত অনুমান করা যায়। এ স্থলে পরম সূক্ষ্মতা বা পরম অব্যক্ততা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যতা বা অবিষয়তামাত্র। অন্যরূপ পরম সূক্ষ্মতার অসম্ভব। পরমব্যক্ত শাখা প্রশাখা প্রসারিত অনেক পাখি-নিকেতন প্রকাণ্ড অশ্বত্থতরুবর অপেক্ষা করিয়া উহার কারণ অশ্বত্থ বীজ পরম অব্যক্ত বা পরম সূক্ষ্ম। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির শরীরের অপেক্ষায় উহার বীজ পরম সূক্ষ্ম ধান্য তৃণ লতা গুল্ম প্রভৃতির অপেক্ষায় তত্তৎ বীজের পরম সূক্ষ্মতা বা পরম অব্যক্ততা এবং তত্তৎ সূক্ষ্মভাবে অনুগত কারণের অপ্রত্যক্ষতা বা অব্যক্ততা সর্ব্বজনের অনুভব সিদ্ধ। যখন অশ্বত্থ বীজ দৃষ্ট হয় তখন এই ক্ষুদ্রতম বীজের অতি বৃহৎ অশ্বত্থ তরুবরের সৃজন শক্তি অনুভূত হয় না। যখন স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে শুক্র শোণিত মিশ্রিতভাবে অবস্থান করিয়া বুদ্‌বুদাকার ধারণ করে তখন তাদৃশ শুক্র শোণিতের তাদৃশ বিচিত্র দেহাদির সৃষ্টি শক্তির অনুমান হয় না। কিন্তু কার্য্য দর্শন করিয়া সেই সেই বীজের তাদৃশ কার্য্য জনন শক্তির অনুমান হয়। এবং সেই সেই স্থূল কার্য্যে তাদৃশ কারণের সমবায়রূপে পরম সূক্ষ্মতা বা পরম অব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যতা জ্ঞানিগণের জ্ঞানসিদ্ধ। এইরূপে যাবতীয় কার্য্য কারণ ভাবের আলোচনায় কার্য্যের অপেক্ষায় কারণ অব্যক্ত, কারণের অপেক্ষায় কার্য্য ব্যক্ত, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ পরম অব্যক্ত। অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃপ্রভবন্ত্য হরাগমে রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে। এই ভগবদ্‌বাক্যে অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি, অব্যক্তে লয় সুপ্রতীত। সেরূপ সুবর্ণ, মুকুট কঙ্কন কুণ্ডলাদি ভাবে ব্যক্ত নামরূপ ধারণ করতঃ অব্যক্ত-রূপে মুকুটাদির অনুগত থাকে। আবার মুকুটাদির অভাবে সুবর্ণমাত্র রূপে পরিণত হয়। এইরূপ মূলপ্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হইয়া অব্যক্তরূপে জগতে

অনুস্যূত থাকিয়া মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিমাত্র স্বীয় রূপ ধারণ করেন। যোগিগণের জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষু দ্বারা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং প্রকৃতিময় জগৎ প্রকৃতিস্থ জীবগণ প্রকৃতি দেখিতে পান না। প্রকৃতিকে সাঙ্খ্যকৃৎ মহর্ষি কপিল গুণ বলিয়া ব্যবহার করেন। বাস্তবিক রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি গুণের ন্যায় প্রকৃতি গুণ নয়; প্রকৃতি নিখিল গুণের আধার দ্রব্য পদার্থ। যেরূপ রজ্জু দ্বারা জ্ঞানহীন পশু বদ্ধ হয় এইরূপ অবিবেক জীবগণের প্রকৃতি দ্বারা বন্ধন হয়, বলিয়া গুণ সাদৃশ্যে উহাকে গুণ বলা হয়। (প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু)। প্রকৃতির গুণে মোহ প্রাপ্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে মগ্ন হয় ইহাকেই বদ্ধ বলে। প্রকৃতি বন্ধেই জীবের অপারমার্থিক বিষয়ে মমতা, মমতা নিবন্ধনই অপার দুঃখময় সংসার সমুদ্র তরঙ্গে নিমজ্জনভাব। প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ সত্ত্ব রজঃ তমোমাত্র। বিকৃত স্বরূপ দেহেন্দ্রিয় পৃথীব্যাদি সমস্ত জগৎ। সত্ত্ব লঘু প্রকাশময় ও সুখময়। রজঃ চলন স্বভাব দুঃখময়। তমঃ আবরণ স্বভাব মোহময়। এই গুণ সমষ্টিই প্রকৃতি। প্রকৃতির সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ প্রকৃতির গুণময়। আমরা দেখিতে পাই সমস্ত পদার্থই সুখ দুঃখ মোহময়। যে পদার্থ সুখময় তাহা দেখিলে জীবের সুখ, দুঃখময় দেখিলে দুঃখের উদয়, মোহময় দেখিলে মোহের উদয় হয়। অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ ও মোহের উদয়ের প্রতি সুখ দুঃখ মোহময় বস্তু কারণ। অর্থাৎ সুখাত্মক বস্তু দেখিলে সুখ, দুঃখাত্মক বস্তু দেখিলে দুঃখ, মোহাত্মক বস্তু দেখিলে মোহ অন্তঃকরণে উদিত হয়, সুতরাং সৃষ্ট বস্তুর সুখ দুঃখ মোহই অন্তঃকরণের সুখ দুঃখ মোহের প্রতি কারণ। ইহাই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। যথা শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকা কুসুম নিকুঞ্জে পতিত হইতেছে তাহা দেখিয়া বিলাসিগণ আনন্দিত বিরহিগণ দুঃখান্বিত, কামার্ত্তকামিগণ মোহান্বিত হইতেছে। এস্থলে চন্দ্রের চন্দ্রিকা সুখ দুঃখ মোহময়, সুতরাং এক চন্দ্র চন্দ্রিকা দেখিয়া বিলাসী সুখ বিরহী দুঃখ কামী মোহ পাইতেছে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে সর্ব্বত্র প্রত্যেক বস্তু সুখ দুঃখ মোহাত্মক এবং ঐ বস্তুর সুখ দুঃখ মোহ অন্তঃকরণের সুখ দুঃখ মোহের প্রতি কারণ ইহাই স্থির সিদ্ধান্তিত হয়। ব্যভিচার হয় না। অবস্থা বিশেষে একই বস্তু সুখ স্বরূপ ধারণ করতঃ জীবকে সুখভোগ করাইতেছে, কখন বা দুঃখ স্বরূপ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করাইতেছে এইরূপ অনেক দৃষ্ট হয়।

যথা এক পবন সঞ্চারে গ্রীষ্মকালে সুখের উদয় ও শীতকালে দুঃখের উদয় হয়। এক সূর্য্য কিরণ সম্বন্ধে গ্রীষ্মে পরিতাপ ও শীতে সুখ হয়। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে জগতে সকলই সুখময় সকলই দুঃখময় প্রতিপন্ন হয়। অতএব সুখ দুঃখ মোহময়, সমস্ত জগৎ দেখিয়া ইহার মূল কারণ প্রকৃতি সুখ দুঃখ মোহময়, সাংখ্যে অনুমিত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানে অনুভূত হয়। অতএব সত্ত্ব রজঃ তমোময় এই জগতের মূল কারণ প্রকৃতি শব্দের বাচ্য জানিবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশীতলচন্দ্র শর্ম্মণ।

——:০:——

মৃত্যু-রহস্য।

(তৃতীয় সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—শেষাংশ।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়াপাত হইল। প্রতিদিন এই সময় আমি পাঠ : করিয়া একটু হারমোনিয়ম বাজাইয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিতাম। বাজনার শব্দ শুনিলেই লাবণ্য আমার গৃহে আসিত,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে আমার সহিত গান বাজনা করিত। এই দিন চিত্তের এরূপ অবস্থা হওয়াতে অবশ্য সঙ্গীতালোচনার কথা আমার মনেই হয় নাই, বাজনা স্থগিত ছিল।

এ দিকে লাবণ্য নাকি ইহার মধ্যে দুই চারিবার আমার গৃহের দ্বার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই।

এক্ষণে অকস্মাৎ দুইটী কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার চমক ভাঙ্গিল। স্বর শুনিবামাত্র বুঝিলাম, একটী লাবণ্যের, দ্বিতীয়টী তাহার মাতার। আরও বুঝিলাম লাবণ্য কাঁদিতেছে, আর তাহার জননী তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। কৌতুহলী হইয়া আমি বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চয্য হইলাম।

ব্যাপার এই, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেও যখন বাজনা বাজিল না লাবণ্য

দেখিল, সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহার জননী মনে করিয়াছিলেন আমার পাঠ শেষ হয় নাই সেজন্য গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই, অতএব পাছে পাঠের বিঘ্ন হয় এজন্য লাবণ্যকে আমায় ডাকিতে নিষেধ করেন। পরে তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি নাকি গবাক্ষপথ দিয়া আমায় অপঠনশীল, শয্যাশায়ী অথচ জাগরিত দেখিয়া কন্যাকে তাহা দেখাইয়া উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"তুই ত অত ব্যস্ত হয়েছিস, কিন্তু তুই ঘরে যাস ছেলে তা ভাল বাসে না—ঐ দেখ্ ছেলে পড়ছে না চুপ্ করে শুয়ে রয়েছে, তবু তোকে দরজা খুলে দেয় নি।" এই অভিমান। এই কথাতেই বালিকা এত মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়াছিল যে গৃহিনী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না।

ব্যাপার শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। গৃহিনীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া বিস্ময়ের উপর আমার আরও বিস্ময় বাড়িল। তিনি বলিলেন—

"এখন বাপু তোমার জিনিস, তুমি নিয়ে যাও, যেমন করে পার বুঝাও, আমি আর পারিলাম না।"

কথাগুলা আমার কেমন কেমন ঠেকিল। আমি কতকটা অপ্রতিভ হইলাম। 'আমার জিনিস!' লাবণ্য আমার।—ভাবিতে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তবে কি মুরারী বাবু আমাকে কন্যাদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমার অন্তরদেশ আলোড়িত বিলোড়িত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে গৃহিনী লাবণ্যকে আমার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সে তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল; সুতরাং তাহাকে সান্ত্বনা করিবার ভার আমার উপরই পড়িল। উপস্থিতক্ষেত্রে যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হইল আমি সেইরূপ করিলাম।

লাবণ্য ভূমে বসিয়াছিল, আমি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলাম। মানিনী শয্যোপরি আমার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেই সুন্দর বাহুলতার দ্বারা আমার অঙ্গ বেষ্টন করিয়া আমার বক্ষোপরি তাহার ক্ষুদ্র মস্তক সন্ন্যস্ত করিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে বিস্তর প্রবোধ দিলাম। কি আশ্চর্য্য! যে লাবণ্য কাব্যের কূটার্থ গ্রহণ করিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সেই লাবণ্য তাহার মাতার সামান্য উপহাস বুঝিতে অক্ষম। অথবা রমণী হৃদয় এমনি কোমল।

যাহা হউক আমার প্রবোধ বাক্যে লাবণ্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা চিরদিন আমার হৃদয়ে বিদ্ধ থাকিবে। লাবণ্য বলিল,—

"দেখ তুমি যে আমা হইতে অন্তর থাকিতে ইচ্ছা কর আজি মা বলিলেন বলিয়া আমি জানিতে পারিলাম তাহা মনে করিও না। আমি কয়দিন হইতেই তোমার এরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। আমি কোন গান করিলে সত্বর তাহা বন্ধ করিয়া দাও, কই আগে ত এরূপ করিতে না! আমি বেশীক্ষণ তোমার কাছে বসিলে, তুমি আজকাল কত অছিলায় আমায় সরাইয়া দাও, অথবা নিজে সরিয়া যাও। এ সকল সত্য কি না বল দেখি?"

আমি বাঙনিষ্পত্তি করিলাম না। তাহা অসত্য বলিবার যো ছিল না। কিন্তু যে কারণে আমি এরূপ করিতাম সে কারণ কেমন করিয়া তাহার সাক্ষাতে বলি? আমি অনায়াসে বলিতে পারিতাম পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিয়াছে এ জন্য এরূপ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কিন্তু সত্য গোপন করিতে আমি শিখি নাই। অপ্রিয় হইলেও সত্য বলিব, সাহস করিয়া লজ্জা পরিহার করিব, সকলই বলিব সঙ্কল্প করিলাম। আমি বলিলাম—

"দেখ লাবণ্য, আমি তোমার সহিত মিথ্যা ভান করিব না। আমি তোমাকে পরিহার করিতে চাই কখনও স্বপ্নেও ভাবিও না। যে কারণে আমার ব্যবহার তোমার অপ্রীতিকর হইয়াছে তাহা শুনিলে তুমি আমার উপর রাগ করিবে না।"

সে বলিল—"সে কারণ যে আমি বুঝি নাই তাহা তুমি মনে করিও না।"

বলিতে বলিতে বালিকার মুখমণ্ডল আবার মেঘাবৃত হইল, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ ভাষে সে বলিতে লাগিল, "কিন্তু যে কারণেই তুমি আমায় হেলা কর না কেন, আমি তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, তাহাতে আমার কষ্ট নাই কিন্তু অপরে ইহা জানিতে পারিল ইহাই আমার দুঃখ; লজ্জা ঘৃণায় আমি তাহাতেই মরমে মরিতেছি।"

আমি বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিলাম—"হেলা আমি তোমায় করি নাই, তাহা সম্ভব নহে, কিন্তু যদি তর্কের অনুরোধে তাহাই স্বীকার করি, 'অপর' আর কে তাহার সাক্ষী—তোমার জননী? তাহাতেও তোমার লজ্জা ঘৃণা বোধ হয়? এঃ! তুমি অত্যন্ত ছেলে মানুষ!"

লাবণ্য। "ছেলে মানুষ নহি। তুমি পুরুষ, রমণীর হৃদয়ের ব্যথা কি বুঝিবে? নহিলে—"

বালিকা আর বলিল না, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "নহিলে কি?"

লাবণ্য। "নহিলে আর কি, এরূপে আর পায়ে ঠেলিতে না।"

করুণরসে আমার হৃদয় আপ্লুত হইল। বলিলাম, "তুমি ত জান আমি কৃতদার।"

লাবণ্য। "তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন কি? আমি তোমার পদপ্রান্তে আশ্রয় লইতে যাইতেছি, তোমাকে অধীন করিতে চাহিতেছি না। তুমি একটা ছাড়িয়া সহস্র দারপরিগ্রহ কর না, তাহাতে যদি তুমি সুখী হও, আমি আত্মসুখের জন্য তাহার অন্তরায় হইব কেন? আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইতে চাহি না"—বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিতেছিলাম তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিতেছিলাম। কি অগাধ নিঃস্বার্থ প্রেম! এক ... ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ভালবাসা ধরিতে পারে আমি জানিতাম না। আমারও হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গেল উচ্ছাসভরে আমিও কত কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমি যুবক, আমি প্রেমিক, প্রগল্‌ভ হইব বিচিত্র কি? কিন্তু সকল কথা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকও নাই, অবসরও নাই। তবে লাবণ্যের নিঃস্বার্থতাব্যঞ্জক কতক কতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠক তাহা হইতে দেখিবেন সে সকল কথা শুনিলে কে না উন্মত্ত প্রলাপ বকিবে? আমি তাহার নিঃস্বার্থতার সুখ্যাতি করিলে—লাবণ্য যাহা বলিয়াছিল তাহা ইহজীবনে আমি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

"দেখ যথার্থ পক্ষে আমি নিঃস্বার্থ নহি, আর নিঃস্বার্থ নহি বলিয়াই আমি তোমার পত্নীর সুখে অন্তরায় হইতে চাহি না। আমি সে সুখে বিঘ্ন জন্মাইলে হয়ত তুমি অসুখী হইবে। কিন্তু তোমার সুখেই আমার সুখ, সেই আমার স্বার্থ। আমি স্বার্থের অনুরোধে তাহাকে অসুখী করিতে পারিব না।

প্রেমালাপনে কথা কাটাকাটিতে একটা আনন্দ আছে। আমি তর্কের অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিলাম--

"আমি অসুখী না হইলে তুমি সুকুমারীর ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত নও?"

তাহাতে লাবণ্য কিয়ৎক্ষণ বিলম্বের পর বলিল—"দেখ তুমি প্রত্যয় কর না কর আমি সত্য বলিতেছি, আমি যেমন নিঃস্বার্থ নহি, তেমনি নির্ম্মমও নহি। তোমার সংসর্গে যে কি সুখ তাহা আমি বুঝিয়াছি, আর তাহা ভাল বুঝিয়াছি বলিয়াই সে সুখে যিনি অধিকারিণী তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

কি অনির্ব্বচনীয় সরলতা! কি আশ্চর্য্য উদারতা! কে না বলিবে ইহার নিকটে বসিলে হৃদয়ের প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয়? আমার জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি তাহাই ইহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই রমণীরত্ন লাভ বিস্তর সৌভাগ্যের কথা।

আমি মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহার সরল মধুর উদার বাক্যাবলী শুনিতে ছিলাম। শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হইলে আমি সুকুমারীর পক্ষ হইতে আর একটা মৌখিক প্রশ্ন করিলাম। বালিকা উত্তরে বলিল—

"তিনি যদি কাহাকেও তাঁহার সুখের অংশী না করিতে চাহেন তাঁহার পদপ্রান্তে আমার এই ভিক্ষা, তিনি সপত্নীভাবে আমায় তাঁহার সুখের ভাগ না দিন, দাসী ভাবে আমায় তাঁহার সেবা করিতে দিন। যাঁহার সুখে তুমি সুখী, তাঁহাকে সুখী করিয়া আমি যদি কিয়ৎ পরিমাণেও তোমার সুখ বিধান করিতে পারি, আমি তাহাতেই আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিব।"

পুনরপি লাবণ্য সলজ্জভাবে বলিল,—আহা! সে লজ্জা বড় সুন্দর, বড় মধুর!—"ফল কথা, আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না, কেবল দিনান্তে একবার চক্ষের দেখার জন্য আমি দাস্যবৃত্তি করিতে প্রস্তুত।"

আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। আমি স্বর্গে না পৃথিবীতে?—একবার ভাবুন, পঞ্চদশবর্ষীয়া অসামান্যা রূপসী একটী যুবতী এই কথা সবিনয়ে আপনার হাত ধরিয়া বলিল—আবার চক্ষে ধারা দেখা দিল! আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—

"তুমি যথার্থই আমায় এতই ভালবাস?" অভিমানে বালিকার কপোল দেশ রক্তিমাভ হইয়া গেল। মানিনী মান ভরে বলিল—

"তুমি বলিয়া তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলে, অন্তর্যামী জানেন, আমি তোমাকে এতই ভালবাসি, হৃদয় খুলিয়া দেখাইবার নহে, নহিলে বুক চিরিয়া দেখিতে পারিতে।"

কথা গুলা বড় পুরাতন, কিন্তু যে সময়ে এই সকল কথা হইয়াছিল আনুসঙ্গিক হাব ভাব ও কণ্ঠস্বরে কখনই তাহার কৃত্রিমতা অনুভব করা যাইত না। বস্তুতঃ পক্ষে আমি উহার প্রত্যেক বাক্যে এক একখানি অপূর্ব্ব কাব্যের সমাবেশ দেখিয়া ছিলাম।

এই বৎসর আমাদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকাতে সেক্সপিয়রের টেম্পেষ্ট অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই প্রেমালাপের সময় স্বতঃই মিরাণ্ডার প্রণয়োক্তি আমার মনে আসিতে ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি তাহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলাম। সে যাহা হোক জগতের শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনাসম্ভবা সেই বনবিহারিণী সরলাবালা—আজি আমার চক্ষে অন্ততঃ—এই রক্তমাংস-গঠিতা সংসার-পালিতা রমনীর নিকট কোমলতা উদারতা ও নিঃস্বার্থতা গুণে হারি মানিল।

টেম্পেষ্ট পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মিরাণ্ডাকে আমার প্রগল্‌ভা মনে হইয়াছিল, আজি আমি বুঝিলাম, তাহা প্রগল্‌ভতা নহে, হৃদয়ের আবেগ। এমনই অসহ্য, প্রেম এমনই উচ্ছৃঙ্খল। কি আশ্চর্য্য! লাবণ্যের সাহায্যে আমি সেক্সপিয়র বুঝিলাম। তাহার নিজের কথা শুনুন—

"আমি নির্লজ্জের মত তোমাকে অনেক কথা বলিলাম, আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি আমা হইতে অন্তর হইতে চাও আমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব? আমার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে তুমি কেমন করিয়া জানিবে। বলি শুন, আমি নির্লজ্জ নহি, প্রাণের যন্ত্রনায় লজ্জা পরিহার করিতে হইয়াছে। হয় ত তুমি আমায় ঘৃণা করিবে, তুমি আমায় লজ্জাহীনা বলিবে? কিন্তু তোমার কাছে আমার লজ্জা কিসের, আমার মনের ভাব তোমার নিকট গোপন করিতেই আমার লজ্জা। তাহা করিলে আমার লজ্জাশীলতা রক্ষা হইত বটে কিন্তু তুমি আমার চরিত্র জানিতে পারিতে না। তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে আমি সুখী হইব সত্য, কিন্তু প্রবঞ্চনা করিয়া সে হেন সুখ লাভেও আমার মতি নাই।"

যথার্থ কথা বলিতে কি এই কথা শুনিবার পর বালিকার পদতলে পড়িয়া তাহাকে আমার পূজা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে লাবণ্য আরও বলিয়াছিল—"দ্বিতীয়তঃ লজ্জা করিয়া আমি করিব কি, লজ্জা লোকসমাজে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ? আমি হিন্দু ললনা, পুরাণে পড়িয়াছি, মনে মনে বরণ করিলেই বিবাহ হয়। বিবাহ একবার বই দুইবার হয় না।—(হায় আমি নিজে এ কথা কেন বুঝিলাম না ?)—মনে মনে আত্মসমর্পণ করিবার পর জন্যান্তরের সহিত বিবাহে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলেও তোমা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। এই জন্যই তুমি আমা হইতে অন্তর হইতে চাহিলে আমার এত কষ্ট হয় আমি এত যাতনা পাই। তুমি মনে রেখো আমাকে চিরদিন তোমার দাসী থাকিতে হইবে।"

আমার বড় আনন্দ হইল ইংরাজী ধরণে শিক্ষিত হইলেও লাবণ্যের হৃদয় এতদূর স্বধর্ম্ম পরায়ণ ছিল। আমারও ভক্তি বাড়িল।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া একবার মাত্র আমার মনে হইয়াছিল, লাবণ্যাদির সম্বন্ধেই তিনি "প্রতারক ষড়যন্ত্রী" কথাটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য লাবণ্যের সহিত আলাপনের সময় আমি তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর যদি বা প্রচ্ছন্ন ভাবে কোন সন্দেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে, এ অমিয় কথা শুনিবার পর তাহা সম্পূর্ণ ধৌত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, ইহার পর যথারীতি আমিও লাবণ্যের নিকট আমার অকৃত্রিম ভালবাসা জানাইলাম, আত্ম সমর্পন করিলাম, জীবনে মরণে তাহারই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, অধিক কি, তাহাকে লাভ করিবার জন্য যদি আমার স্বর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয় তাহাতেও আমি স্বীকৃত হইলাম।

এইরূপে আমাদের সমাপিত হইল। পদ্ধতি বিপরীত, কোথায় আমি সম্মতি পাইব, না আমি সম্মতি দিলাম। এক্ষণে মুরারী বাবুর সম্মতি মাত্রের অপেক্ষা।

ক্রমশঃ—

শ্রীভঃ—

অলৌকিক ঘটনাবলী ।

[৪]

১৮৮২ খৃঃ অব্দে আমি বাঁশবেরিলীতে ছিলাম। সেখানকার বাঙ্গালী প্রবাসীদের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। ইহঁাদের মধ্যে উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুন্‌সেফ ৺ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এই উভয়ের সহিত রীতিমত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। মুন্‌সেফ বাবু শীতকালে প্রত্যহ প্রত্যুষে আমার বাসায় আসিতেন ও আমরা উভয়ে বায়ু সেবনার্থ নগর পরিভ্রমণে যাইতাম এবং সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই প্রত্যাগত হইয়া মুন্‌সেফ বাবুর বাসায় চা সেবন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতাম। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদিন আমি মুন্‌সেফ বাবুর বাসায় বসিয়া চা পান করিতেছি এমন সময়ে আমার অপরিচিত জনৈক প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে নিদ্রোত্থিত হইয়া আসিয়া আমাদিগের নিকট বসিলেন। পরে পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে তিনি মুন্‌সেফ বাবুর বৈবাহিক, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা চিত্রকরের পিতা। তিনি তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে কন্‌ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্কটাপন্ন পিড়ার সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশে যাইবার মানসে পূর্ব্বরাত্রে মুন্‌সেফ বাবুর বাসায় আসিয়াছিলেন। অনন্তর পরস্পরে আলাপ পরিচয় হইবার পর সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটি শৌচাদি সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে "গাড়ু" হস্তে উপরতলা হইতে নিম্নতলে গমন করিবার জন্য সিড়ি অবতরণ করিতেছেন এমন সময় সহসা চীৎকার করিয়া সিড়ির উপরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। "গাড়ুটী" গড়াইতে গড়াইতে নীচে গিয়া পড়িল। মুন্‌সেফ বাবু ও আমি "কি হইল ?" কি হইল ?" বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া ধীরে ধীরে উপরের নিকটস্থ কোন ঘরে লইয়া আসিয়া তাঁহার সংজ্ঞা লাভের উপায় করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টা ও যত্নের পর তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, একটি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘটনাটী এই যে তিনি দুই একটী ধাপ নামিতে না নামিতে দেখিলেন যে নিম্নদেশ হইতে তাঁহার পিতা অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায় উপরে উঠিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া "অঘোর" বাবু (আগন্তুকের নাম) চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

এইরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রকার তর্ক ও যুক্তির অবতারণা করিয়া অবশেষে তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাওয়াতে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল, সুতরাং পূর্ব্বরাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়াতেই মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চয় হইয়াছিল ও তজ্জন্যই এইরূপ বিভীষিকা দর্শন ঘটিয়াছে। অনন্তর তাঁহাকে এই পরামর্শ দেওয়া গেল যে, "আপনি প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তমরূপে সর্ব্ব শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নান আহার করিয়া একটু নিদ্রা যাউন, তাহার পর রাত্রের মেল ট্রেনেই কলিকাতায় যাত্রা করিবেন।"

এই প্রকারে তাঁহাকে কিছু প্রবোধ দিয়া আমি আপন কার্য্য করিতে প্রস্থান করিলাম। অপরাহ্নে আবার মুনসেফ বাবুর বাটী গিয়া দেখিলাম যে, অঘোর বাবু ও মুনসেফ বাবু কথোপকথন করিতেছেন। আমিও গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম ও অপরাহ্নিক চা পানের যোগাড় করিতে আদেশ দিয়া তিনজনে নানা বিষয়ের আলাপ করিতেছি, এমন সময় "টেলিগ্রাফ পিয়ন" আসিয়া একখানি মেসেজ্ মুনসেফ বাবুর হস্তে প্রদান করিল। তাহার শিরোনামে অঘোর বাবুর নাম দেখিয়া তাঁহার হস্তে খামখানি দিয়া "পিয়ন" কে বিদায় দিলেন। অঘোর বাবু খাম খুলিয়া পড়িয়াই আবার চিৎকার করিয়া উঠিলেন ও আমাদিগকে সংবাদটি পাঠ করিতে দিলেন। আমরা পাড়িয়া দেখি যে পূর্ব্বরাত্রে অঘোর বাবুর পিতা কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও প্রাতে তাঁহার দেহ সৎকার জন্য স্মশানে আনীত হইয়াছে। এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা সকলে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ দেখিতে লাগিলাম ও বুঝিলাম যে অঘোর বাবু যে বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন তাহা কল্পিত নহে তাঁহার পিতা মৃত্যু কালীন একমাত্র পুত্র অঘোর নাথকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল থাকায় প্রাণ বিয়োগ হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ জ্বলন্ত চিতা হইতে একেবারে বেরীলিতে গিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। নানা দেশে এরূপ অনেক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। "তন্হা" বা "তৃষ্ণা" চরম কালে যেরূপ প্রবল থাকে তদনুসারে জীব সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া দেশ, মহাদেশ, সমুদ্র, মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া থাকে। পরিশেষে এস্থলে আর

একটী কথা বলা আবশ্যক, অনুসন্ধানে জানা গেল যে, যে সময়ে অঘোর বাবু ঐ বিভীষিকা প্রদর্শন করেন ঠিক সেই সময়েই তাঁহার পিতার মৃতদেহ চিতায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল।

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

---

[৫]

এক্ষনে আমার বয়ক্রম ৬২ বৎসর হইবে। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আমি আমার বাল্য সখা মেদিনিপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক (তাৎকালিক হেড্ পণ্ডিত) স্বর্গীয় ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত একত্রে মেদিনীপুর যাই। সেই আমার প্রথম মেদিনীপুর যাওয়া হয়; উহার পূর্ব্বে মেদিনীপুর কেন ও অঞ্চলে আর আমি কখনই যাই নাই। সে সময়ে উলুবেড়িয়া হইতে পাঁশকুঁড়া পর্য্যন্ত কেনাল (Canal) খোলাছিল। মেদিনীপুর যাইতে হইলে, পাঁশকুঁড়ায় নৌকা ছাড়িয়া ডাকে বা গরুরগাড়ী দ্বারা যাইতে হইত। যান পরিবর্ত্তন করিবার অনুরোধে প্রায় সকলকেই পাঁশকুঁড়ায় কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিতে হইত। আমরা ও ঐরূপ বিশ্রাম উপলক্ষে পাঁশকুঁড়ার বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবা মাত্রই আমার মনে কেমন একটা বিস্ময়কর ভাবের আবির্ভাব হইল,—চতুর্দ্দিকের সমস্ত দৃশ্য যেন আমার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমার চরণ যেন আর চলিতে চাহে না পদদ্বয় অষাড় হইয়া পড়িল—আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম, দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। আমার বাল্য সুহৃদ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, আমাকে অনুগমনে সহসা বিরত দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন "শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আইস না, পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক কি দেখিতেছ?" আমি বলিলাম "ভাই তুমি একটু দাঁড়াও আমার কোন বিষয় জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে" তাহাতে তিনি আমার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এখানে রাস্তার মধ্যে আবার তোমার কি জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল" তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "এইস্থানের উত্তর দিকে খোয়া পাতা লাল রংয়ের একটী রাস্তা ও তাহার

দুই পার্শ্বে সুদৃশ্য দুইখানি বাংলা ঘর আছে কি ?” তিনি বলিলেন “হাঁ ইহার ঠিক উত্তরেই মেদিনীপুর যাইবার পাকা রাস্তা, তাহার দুইধারে দুইটী সুন্দর বাংলা আছে একটী স্কুল ও অপরটী ডাক ঘর।” তাঁহার সহিত আমি সেইদিকে চলিলাম, গিয়া দেখিবা মাত্রই যেন পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল—উহা আমার সম্পূর্ণরূপে পরিচিত বলিয়াই অনুভূত হইল। সঙ্গীকে আবার বলিলাম, “আচ্ছা এই স্থানের সন্নিকটেই একটী হরীতকী গাছ আছে কি ?” তিনি বলিলেন, “হাঁ এই বাজারেই একটী প্রকাণ্ড হরীতকী বৃক্ষ আছে” বলিয়াই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া উহা দেখাইয়াদিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই বৃক্ষতলে পূর্ব্বে কতবার বসিয়াছিলাম। আরও অন্যদিকে মুসলমানদিগের আবাসবাটী ও গৃহ পালিত পশু পক্ষী প্রভৃতির থাকিবার স্থান দেখিয়া ও পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়াই বোধ—স্থির হইল।

সঙ্গী বন্ধুবর ইহার মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “তুমি এথানে পূর্ব্বে আসিয়াছিলে নাকি ?” তাহাতে তখন আমি কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলাম যে এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দেও পরে একস্থলে বসিয়া সমস্ত বলিব।” ফলে আরও অন্যান্য স্থান সমূহের পরিদর্শন শেষ হইলে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলাম,—বলিলাম যে “যদিও এথানে আমি এই প্রথম আসিয়াছি তথাপি এথানকার সমস্তই দৃশ্য আমার পূর্ব্ব দৃষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হইতেছে। তখন সুপণ্ডিত বন্ধুবর এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন তাহা লিখিয়া বিষয় বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না ; ফলতঃ তাঁহার তাৎকালিক সেই পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র ও ভূয়দর্শনাভিজ্ঞতা পূর্ণ বাক্যাবলী ও যুক্তি পরম্পরা শুনিয়া আত্মা, কর্ম্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের অজ্ঞেয় ও অননুমেয় মহিমার কণামাত্রও সেই সময়ে আমার হৃদয়ে অনুভূত হইয়াছিল।

ভদ্রেশ্বর। শ্রীমোক্ষদা দাস সরকার।

উপরোক্ত ঘটনাটী পাঠ করিলে কি বিবেচনা হয় ? পাঠক মহাশয়গণ! ইহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নহে কি ?—পঃ সঃ।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, ডাক্তারী ও কবিরাজী শাস্ত্রের রহস্যবিদ্ ভিষক্, প্রসাবয়িতা ও অস্ত্রচিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটির মেম্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৩৬নং ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের অকৃত্রিম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধাতুঘটিত সমস্ত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট জারিত ও শোধিত ধাতু দ্রব্যাদি ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মফঃস্বলের রোগীগণের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে সহজ মুষ্টিযোগ ও পাঁচনাদিসংগ্রহসহ বিনামূল্যে ব্যবস্থা পাঠান হয়।

প্রমেহবিন্দু।

ইহা সেবনে মুহুর্ম্মুহু প্রস্রাবের বেগ, মস্তকের দৌর্ব্বল্য, শিরোঘূর্ণন, মেহ, মধুমেহ—ধাতু তারল্য, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, নূতন পুরাতন ও ঔপসর্গিক মেহ, হস্ত ও পদের দাহ এবং তৎসঙ্গে জ্বরদোষ প্রভৃতি সত্বর প্রশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা ধাতু-দৌর্ব্বল্যের একটী অমোঘ মহৌষধ। এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাক মাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ দশ আনা।

কবিরাজী-শিক্ষা।

চতুর্থ সংস্করণ ৫৫০ বিশেষ পরিবর্দ্ধিত অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে যাবতীয় রোগের লক্ষণ, ঔষধ—প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে ইহা ৫ম খণ্ডে বিভক্ত ১ম খণ্ডে নাড়ীজ্ঞান, রোগ পরীক্ষাদি, ২য় খণ্ডে জারণ মারণ ঔষধ শোধনবিধি, ৩য় খণ্ডে পাঁচন প্রস্তুত প্রণালী, ৪র্থ খণ্ডে বিষ চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ, ৫ম খণ্ডে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান স্থানসমূহের বিস্তৃত বিবরণ, কবিরাজ এবং গৃহস্থগণের এই পুস্তকখানি অভিধানের ন্যায় কার্য্যে আসিবে। প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মতামত দেখুন মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাক মাশুল ।০ চারি আনা।

KEATING INSECT POWDER

আমার গৃহিণীপনা শিক্ষা।

এ এক রহস্য।

..রুণ গ্রীষ্ম—জ্যৈষ্ঠ মাস, হুহু করিয়া আগুণের মত গরম হাওয়া বহিতেছে। আমি আমার দাসীকে সঙ্গে লইয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এটি আমার শয়ন কক্ষ। শয্যার নিকট গিয়া এক দুই করিয়া সমস্ত বালিসগুলি নিজ হস্তে নামাইলাম, বলিলাম ঝি! এই গুলো সব রোদে দিয়ে আয়—আর এই পালংখানায় সব গরম জলদে। আবার কাল শনিবারে আসিয়া বলিবেন "তুমি মোটে গৃহিণীপনা জান না" হ্যা ঝি! আবার কি করিব বল দেখি, এত করিতেছি এতেও যদি ছার পোকা না মরে ত আমার দোষ কি? ঝি বালিস বিছানাটা রোদে ফেলে দিতে দিতে বলিল "তা বৈকি মা। বিছানা রোদে দেওয়া—গরম জল দেওয়া হইল। শনিবারে আমার স্বামী কর্ম্মস্থান হইতে আসিলেন। স্বামী আহারে বসিয়াছেন, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"দেখুন আমি গৃহিণীপনা শিখিয়াছি।" স্বামী একটু হাসিলেন, বলিলেন—কি প্রকার? আমি বলিলাম "গরম জলে সব ধুইয়াছি, বোধ হয় আর ছারপোকা নাই।

আমি যা মনে করেছিলাম তা হল না, ছারপোকা মরে নাই—স্বামী শয্যায় ঘুমাইতে পারিলেন না, ছারপোকার দংশনের জ্বালায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমার চক্ষে জল আসিল, সমস্ত রাত্রি স্বামীপার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিলাম। প্রাতঃকালে স্বামী বলিলেন, "আমি কর্ত্তাপনা শিখিয়াছি।" উপহাস আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। কথাটী কহিলাম না।

পরদিন আমার দিদি কলিকাতা হইতে আমাদের বাটী আসিলেন। স্বামী আহারে বসিয়াছেন—দিদি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু বলিলেন "অপর সব ভাল কিন্তু রাত্রে ঘুমাইবার যো নাই।" দিদি—কেন? স্বামী—বড় ছারপোকা, আপনার ভগিনীকে শুধান? পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কেমন গৃহিণীপনা শিখিয়াছ তোমার দিদিকে একবার পরিচয়টা দাও।" দিদি বলিলেন সরলা গৃহিণীপনা না জানুক—তার দিদি জানে। আজ দেখাইব।" সন্ধ্যার সময় দিদি একটা কৌটার ভিতর হইতে কতকগুলি গুড়া লইয়া শয্যার সমস্ত কিনারায় দিলেন রাত্রে স্বামী শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইলেন। আমি ত অবাক্ স্বামী প্রাতে উঠিয়া দিদিকে ডাকিয়া বলিলেন "আপনি কি জানেন? ছারপোকা আর নাই!" দিদি আপনার বাক্স হইতে কৌটাটী বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন—তিনি পড়িলেন "কিটিংএর অতুলনীয় কীটনাশক মহৌষধ।" স্বামী পড়িয়া বলিলেন—কোথায় পাওয়া যায়?

দিদি:—কলিকাতার ৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে বিহারীলাল দাঁ কোং বিলাত হইতে আমদানী করিয়াছেন। ইহাতে শুদ্ধ ছারপোকা নয়—মশা, মাছি, আরসোলা ও পশুপক্ষীর গায়ের কীট নষ্ট হয়; ইহা কোন গৃহপালিত পশু পক্ষীর বা মানুষের প্রাণহানিকর নয়। বড় ভাল জিনিস। স্বামী আমার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—সরলা! গৃহিণীপনা শিখলে ত? সেই অবধি আমি কিটিংস পাউডার ব্যবহার করি। দাম—ছোট ।৵০, বড় ॥৶০